দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বাংলাদেশে মানবতা লঙ্ঘনের ঘটনায় বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলি চুপ কেন? — পৃঃ ১৫

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও ভারতবিদ্বেষ অর্থনৈতিক যুদ্ধই একমাত্র প্রতিকার — পৃঃ ১৩

৭৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪।। ১৪ পৌষ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৪ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৩০ ডিসেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

হস্তক্ষেপের ঠুনকো দোহাই সন্দেহাতীত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়

নান্যঃ পন্থা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পুলিশ ওরে পুলিশ মন দিয়ে দিদির কথাই শুনিস

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিদের উত্থান ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নের স্পষ্ট সংকেত

□ এম এ হোসাইন □ ৮

ওপারের হিন্দু বাঙ্গালি নিধনে এপারের বাঙ্গালি আজ এতো বিচলিত কেন? □ বিশ্বামিত্র □ ১০

বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে দু'পারের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে □ প্রবীর ভট্টাচার্য্য □ ১১

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতন ও ভারতবিদ্বেষ : অর্থনৈতিক যুদ্ধই একমাত্র প্রতিকার □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ১৩

বাংলাদেশে মানবতা লঙ্ঘনের বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলি চুপ কেন? □ কানু রঞ্জন দেবনাথ □ ১৫

পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন সেই মুঘল শাসনকালে শুরু, চলছে আজও □ সায়ন্তন বসু □ ১৭

কালাপাহাড়ের ইতিহাস হোক উন্মোচিত

□ উত্তম মণ্ডল □ ১৯

অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগঠিত হতে হয়

□ ভাস্কর ভট্টাচার্য □ ২০

এক জাতীয় বীর লাচিত বরফুকন □ গিরিরাজ দে □ ৩১

স্বাধীনতার সিংহ বিপিনচন্দ্র পাল □ দীপক খাঁ □ ৩৩

ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়ে হবে না, ভারতই শেষ কথা বলবে

□ ধর্মানন্দ দেব □ ৩৫

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জেহাদি আন্দোলনের লক্ষ্য 'অখণ্ড ইসলামি বাংলা' □ ৩৭

বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতির ইতিহাস এবং আগামীদিনের সম্ভাব্য বিপদ □ সুদীপ্ত গুহ □ ৪৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

□ বিপ্লব বিকাশ □ ৪৫

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয় : রাষ্ট্রনির্মাণের এক বিস্ময়কর কর্মশালা

□ সাধন কুমার পাল □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

□ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে ৬ জানুয়ারি ২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৬ জানুয়ারি ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চৈতন্য জাগরণ

জাতির জীবনে যখন বিপর্যয় নেমে আসে, জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে দিশেহারা হয়, তখন মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা জাতির চৈতন্যোদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতবর্ষে যুগে যুগে মহাপুরুষরা আবির্ভূত হয়ে জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। বঙ্গভূমিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ জাতির পথপ্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন ড. সর্বাণী চক্রবর্তী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, রাজদীপ মিশ্র, সাধন কুমার পাল, অর্ণব দাস, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে

আরব দস্যুদের সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া বঙ্গভূমিতে পৌঁছাইতে পাঁচশত বৎসর ভারতের বীর যোদ্ধাদিগের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ছলে-বলে-কৌশলে তাহারা ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশ দখল করিয়াছে। তাহাদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে সুফি দরবেশের দল। আরব সাম্রাজ্য বিস্তারে ইহারা পঞ্চমবাহিনী রূপে কাজ করিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন অনুচর লইয়া বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে এক সুফি দরবেশ শাহজালাল। তুকতাক, ঝাড়ফুঁকে প্রলোভিত করিয়া বঙ্গের সাধারণ মানুষকে তাহারা ধর্মান্তরিত করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কালক্রমে ইহারাই তুর্কি আক্রমণকারীদের সহায়তা করিয়া বঙ্গভূমিতে তুর্কি শাসন কায়েম করিয়াছে। সম্পূর্ণ ইসলামি শাসনকালে হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরের মাত্রা অব্যাহত থাকে। ইংরাজ শাসনকালেও ইহার কোনোপ্রকার ব্যত্যয় হয় নাই। মুসলমানদের শত অপরাধ ইংরাজ শাসক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিত। এইভাবে পূর্ববঙ্গ মুসলমানবহুল ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময় হইতেই এই ভূখণ্ড হিন্দুশূন্য করিবার জন্য নানাপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন চলিতে থাকে। দেশভাগের সময় সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার চক্রান্ত শুরু হয়। জিন্নার সেই চক্রান্তে কয়েকজন হিন্দু নেতাও শামিল হইয়াছিলেন। কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় হিন্দুবহুল পশ্চিমবঙ্গ ভারত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলমানবহুল হওয়ার কারণে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলামি দেশ হইবার কারণে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার নামিয়া আসে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভিটেমাটি ত্যাগ করিয়া, মাতা-ভগ্নীর সম্মান হারাইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কবল হইতে স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করিলেও হিন্দুদের অবস্থার কোনোপ্রকার উন্নতি হয় নাই। অথচ স্বাধীনতার যুদ্ধ হিন্দুরাও সমানভাবে লড়িয়াছে। শেখ হাসিনার শাসনকালে কিছুটা হইলেও অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু গত ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে বিতাড়িত করিবার পর পুনরায় হিন্দুদিগের উপর মাত্রাছাড়া অত্যাচার নামিয়া আসিয়াছে। লক্ষণীয় হইল, পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে শামিল হইয়াছে। হিন্দুদিগের নেতৃত্বদানকারী ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে অন্তর্বর্তী সরকারের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিচারের নামে প্রহসন চলিতেছে। তাঁহার মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী হিন্দুরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে।

ভারত সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখিয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংহ সংসদে জানাইয়াছেন, বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ২২০০টি হিংসার ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার সিংহভাগই ঘটিয়াছে জেহাদি অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত করিবার পর। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়াছে। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, শত অত্যাচারেও বাংলাদেশের হিন্দুদিগের মনোবল কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এহেন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ কি কোনোপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে? প্রশ্ন এইজন্যই উঠিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও বাংলাদেশের চাইতে কোনোপ্রকারে উন্নত নহে। বাম শাসন হইতে শুরু করিয়া বর্তমান শাসনকালে সীমাহীন তুষ্টীকরণের রাজনীতির ফলে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হইয়াছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া আল কায়েদা-সহ বিভিন্ন জঙ্গি এই রাজ্যে ঘাঁটি গাড়িয়াছে। শাসকদলের মদতপুষ্ট জেহাদিরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। শাসকদলের মদতেই রাজ্যের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে মিনি পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা গর্বের সহিত স্বীকারও করিয়াছেন রাজ্য সরকারের এক দায়িত্বশীল মন্ত্রী। তিনি ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা অনবরত হিন্দুদের বিরুদ্ধে গরল উদ্‌গীরণ করিতেছে। এককথায় পশ্চিমবঙ্গেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা। বিলম্বে হইলেও তাঁহার বোধোদয় ঘটিয়াছে। এই রকম পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের হিন্দু সমাজ কি সুখে কালযাপন করিবে? তাহারা কি ভাতা, ভাণ্ডারের মোহে আচ্ছন্ন থাকিবে? বাংলাদেশের হিন্দুদের হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে পশ্চিম বাংলাদেশের অধিবাসী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগকে বেশিদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।

সুভাষিতম্

স্বদেশে কষ্টমাপন্নে দূরস্থা লোকয়ন্তি যে।
নৈব চ প্রতিকুর্বন্তি তে নরাঃ শত্রুনন্দনাঃ।।

দেশ যখন বিপদের মধ্যে পড়ে, তখন প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা না করে যারা উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, তারা শত্রুদেরই আনন্দ দান করে থাকে।

হস্তক্ষেপের ঠুনকো দোহাই সন্দেহাতীত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়

নান্যঃ পন্থা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অভয়া মামলা থেকে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার সরে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই তা সন্দেহ আর হতাশার চোখে দেখছেন। কেন হস্তক্ষেপের দোহাই দিয়ে বৃন্দা সরে গেলেন? কারও মতে মামলায় পরাজয় বুঝে বৃন্দা সরে গিয়েছেন। কারও মতে অজানা হাত তাঁকে সরতে বাধ্য করেছে। সরকারের দুর্নাম এড়াতে মমতা ব্যস্ত। বিভিন্ন মহলের প্রভাবশালীদের সঙ্গে তিনি নাকি সেটিংে মরিয়া। এইভাবেই তদন্তের গতিপ্রকৃতিকে তিনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারেন, আদালতকেও হয়তো বগলদাবা করেছেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। সবকিছুতে নিরাশ হওয়া মানসিক অসুখ। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার পর থেকে কিছু মানুষ এই নৈরাশ্য অসুখের শিকার। তারা ভাবছেন মমতাকে হারানো প্রায় অসম্ভব। এরকম নানা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী তারা হয়েছেন। এটা একধরনের ভ্রান্ত ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব যার পোশাকি নাম— 'সিনিসিজম' বা 'সন্দেহবাতিকতা'। এরা সর্বদা নঞর্থক ভাবনার সওয়ারি। সদর্থক চিন্তার পরিবর্তে নৈরাশ্য আর রহস্য রোমাঞ্চকে তাঁরা জীবনে স্থান দিয়েছেন। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' শব্দটি তাদের কাছে নিরর্থক।

ইন্টারভিনিং ফ্যাক্টরস্ বা হস্তক্ষেপজনিত সমস্যার মুখোমুখি মোকাবিলা না করে বৃন্দা সরে গিয়েছেন। বৃন্দা অন্যায় জামিন আটকানোর দায়িত্বে ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর সিবিআইকে সাহায্য করার দায়িত্ব। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের মতে 'জেল ব্যতিক্রম আর বেল (জামিন) নিয়ম'। এমনটা হতেই পারে বৃন্দা সেটাই মানেন। তবে তাঁর সরে দাঁড়ানো নিয়ে যে বিস্তর জল ঘোলা হবে তা তিনি ভালো জানতেন, আর ঠিক সেই কারণেই কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজকর্ম সম্পর্কে যা জানা যায় তা থেকে অনায়াসে বলা চলে কোনো বাইরের চাপ বা প্রভাবশালী চাপের কাছে মাথা নত করার ব্যক্তি তিনি নন। তা হলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভয়ার লড়াইয়ে যুক্ত হতেন না। বৃন্দার আগে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য সরে গিয়েছিলেন। বিকাশবাবু সিপিএম সাংসদ।

অভয়া যে বিচার পাবে না জনমনে এই হতাশা ক্যানসারের মতো ছড়িয়েছে। তাঁর অভিভাবকরাও ওই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র মারফত যত দূর জেনেছি, মামলার পদ্ধতিগত অসুবিধার কারণে বিকাশবাবু আর বৃন্দা সরে গিয়েছেন। অন্য কোনো কারণে নয়। সিবিআই-এর সঙ্গে যৌথভাবে তারা যে কাজ করছিলেন, সেই কাজের পদ্ধতি নিয়ে হয়তো পেশাদারি বিষয়ে তাদের কোনো মতভেদ ছিল। যে কারণে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে তারা সরে দাঁড়িয়েছেন। এর পিছনে কোনো প্রভাবশালী তত্ত্ব যে নেই তা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। যে কোনো বড়ো ধরনের জটিল অপরাধ সমাধানের জন্য তদন্তকারী সংস্থা 'সিবিআই'— কেন্দ্রীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের সবেধন নীলমণি। ১৯৪৬ সালে তৈরি সিবিআইকে তাই 'সুপ্রা পুলিশ' বলা হয়। সিবিআই-এর কোনো বিকল্প নেই। জটিল কেসে সিবিআই ছাড়া সরকার বা বিচারবিভাগের গতি নেই। তাই তাকে প্রভাবিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সিবিআই-এর ব্যর্থতা আংশিকভাবে হলেও তার নিজস্ব দুর্বলতা। অভয়া মামলায় সিবিআই-এর এই দুর্বলতার সঙ্গে মিশে রয়েছে রাজ্য সরকারি ষড়যন্ত্র ও চরম অসহযোগিতা। গত ২৯ নভেম্বর আর জি কর কাণ্ডে সন্দীপ ঘোষ-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে আলিপুরে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই, কিন্তু নবান্নের অনুমোদন না মেলায় জামিন পায় সন্দীপ ঘোষ। এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন দানে ঢিলেমির বিষয়টির সাক্ষী থেকেছে গোটা রাজ্য। অভয়া মামলায় রাজ্য সরকারের ফাঁদে আটকে শেষ পর্যন্ত সিবিআই ব্যর্থ হলে সেটা তার দায়। ইউপিএ আমলে সিবিআইকে ঠাট্টা করে বলা হতো কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন আর খাঁচার তোতাপাখি। অভয়া মামলায় সিবিআই হলো 'নান্যঃ পন্থা'। তাই যদি কেউ ধর্ষকদের সিবিআই-এর তদন্তের বিরোধিতা করে তাকে সেই মামলা থেকে নিজেই সরতে হবে। অভয়াকাণ্ডে খুনি-ধর্ষকদের শাস্তি দেওয়ার একমাত্র মুখ সিবিআই।

সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় আইনজীবীদের নেতৃত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সুপ্রিম আদালতে তিন কন্যার লড়াইয়ের থেকে আপাতত বৃন্দা সরে দাঁড়িয়েছেন। করুণা নন্দী আর ইন্দিরা জয় সিংহ লড়াই জারি রেখেছেন। এই লড়াইয়ের মুখ হয়ে উঠেছিলেন সৌরভি, কিঞ্জল, অনিকেতের মতো চিকিৎসকরা। সবার অলক্ষ্যেই এখনও জারি রয়েছে তাদের সম্মিলিত প্রয়াস। তাঁরা কোনো নিরাশার রোগে আক্রান্ত নন। সুপ্রিম আদালতে আইনজীবীদের মহিলা ব্রিগেড যখন নির্যাতিতা, মৃতা অভয়ার ন্যায়বিচারের জন্য, অভয়ার অসহায় অভিভাবকদের পাশে দাঁড়িয়ে অপরাধীদের শাস্তির জন্য রাতদিন এক করে লড়ছেন, তখন এ রাজ্যেরই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সেই অপরাধ ঢাকতে ব্যস্ত রয়েছেন। গোটা প্রশাসনকে ব্যবহার করছেন। এ লজ্জা রাখব কোথায়? তাই সিবিআই-ই নান্যঃ পন্থা। কন্যাশ্রী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ঢাকনায় সে অন্যায় যাতে চাপা না পড়ে তা জনসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির। এই দায়িত্ব পালনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা আজ সময়ের দাবি।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

> **কন্যাশ্রী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ঢাকনায় অন্যায় যাতে চাপা না পড়ে তা জনসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির।**

পুলিশ ওরে পুলিশ মন দিয়ে দিদির কথাই শুনিস

পুলিশমন্ত্রীষু দিদি,

আপনার অসহায়তার কথা ভেবে সত্যিই আমার মতো কারও কষ্ট হয় কিনা জানি না। কোন দিক সামলাবেন বলুন তো আপনি! ভাই থেকে ভাইপো কেউই কথা শোনে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার সমালোচনার শেষ নেই। আর পুলিশমন্ত্রী হিসেবে আপনার তো অসহায়তার শেষ নেই। দোষ অবশ্য আপনারই। দলের ক্যাডার হিসেবে পুলিশকে ব্যবহার করতে করতে মাথায় তুলেছেন আপনি নিজে। এখন আপনার দলের কুচো নেতারাও পুলিশকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে। ফলে পুলিশ আর পুলিশ নেই। কেমন যেন একটা হয়ে গিয়েছে। আদালতও পুলিশের কাজকর্ম এমনকী জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। এসব দেখে আপনার অনুগত ভাই হিসেবে কি আমার ভালো থাকার কথা? আপনিই বলুন!

আইনের রক্ষকেরই যদি আইনের ধারাগুলি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান না থাকে, তবে সুবিচার চাইতে মানুষ যাবে কোথায়? সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্ট স্বয়ং একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিধাননগরের নগরপালকে নির্দেশ দিয়েছে, স্ব-এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত থানাকে আইনের ধারা সম্পর্কে অবগত করতে। ভাবা যায়! ওই মামলাটিতে অভিযোগ উঠেছিল, রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায় একটি জমি-বিবাদের ঘটনায় পুলিশই হেনস্থা করেছে। রোজই সর্বত্র করে। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে যায়। এক আধজন। তেমনই এক অভিযোগকারীর সুবাদে এই মামলা। পুলিশ এক দিকে মামলাকারীর কাছে লক্ষাধিক টাকা ঘুস চেয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ভুল ধারায় আবেদনকারীর কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়েছে। গোটা বিষয়টি দেখে ক্ষুব্ধ হাই কোর্ট। আমার মনে হচ্ছে আদালতে কেন সকলেই অখুশি হবে। এর জন্য আপনারও দায় আছে। আপনি অনেক সময়েই পুলিশকে যে কোনো মামলা 'সাজাতে' নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দিদি অভিযোগ সত্য হলে সাজাতে হবে কেন। সত্য তো সাজগোজ করানোর জিনিস নয়।

সে যাক গে। এই মামলা একেবারেই ব্যতিক্রম নয়। স্বয়ং হাই কোর্ট যখন পুলিশি নোটিশের ছক ঢেলে সাজাতে কমিশনারেট-কে নির্দেশ দেয় এবং কোনো মামলায় কোনো পক্ষকেই যাতে হয়রানির মুখে পড়তে না হয় তা নিশ্চিত করতে, তখন বোঝা যায় পুলিশের উদাসীনতা কিংবা অতিসক্রিয়তা কোথায় পৌঁছেছে। আইন রক্ষকদের এহেন আচরণ কোনো সভ্য দেশে বিরল। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কারও তুলনা করা ঠিক নয়। এই রাজ্য তো সবার থেকে আলাদা!

রাজ্যে আইনকানুন রক্ষার গুরুদায়িত্বটি পুলিশবাহিনীর উপর অর্পিত। সেই কাজ শুধুমাত্র পেশিশক্তি দিয়েও হয় না। আইনজ্ঞানও থাকা দরকার। পুলিশ প্রশিক্ষণে শারীরিক কসরতের পাশাপাশি আইন শিক্ষাতেও জোর দেওয়া হয়। সেই কারণেই তাদের প্রশিক্ষণ-পর্ব সময়সাপেক্ষ। এবং সেই কারণেই সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ প্রশাসনিক মহল থেকে 'ম্যান পাওয়ার'-এর অভাবের অজুহাতে প্রশিক্ষণ-পর্বটিকে সংক্ষিপ্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তা অবৈজ্ঞানিক এবং আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কায় ভরপুর। অন্যদিকে, পুলিশের কাছে যারা অভিযোগ নিষ্পত্তির আশায় যান, তাঁদের এক বড়ো অংশের পক্ষে সরাসরি আদালতে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে তাঁদের অভিযোগগুলিকে মান্যতা দিয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপে সহায়তা করাই পুলিশের কাজ। কিন্তু বাস্তবে কী হয়? নাগরিকের বহু অভিযোগে পুলিশ যথোচিত গুরুত্বই দেয় না। গার্হস্থ নির্যাতনের মতো গুরুতর ক্ষেত্রেও 'ঘরেই মিটমাট করে নিন' উপদেশ দেয়। আবার, যে ক্ষেত্রে অভিযোগ ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে, সে ক্ষেত্রে অতি সক্রিয় হয়ে নির্যাতিতকেই হেনস্থার উদাহরণও প্রচুর। এই অন্যায্য আচরণই পুলিশের প্রতি নাগরিক ক্ষোভের অন্যতম কারণ। এখন ক্ষোভ আদালতেরও।

ক্ষোভ আরও আছে। উর্দির অপব্যবহারকে ঘিরে ক্ষোভ। পুলিশ সম্পর্কে একটা কথা বহুল প্রচলিত, তিনি নিজেও আইন মানবেন, অন্যকেও আইন মানতে বাধ্য করবেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা হয় কি? অনেক ক্ষেত্রে পদগর্বী পুলিশ নিজেই অন্যায়ভাবে আইন ভেঙে পার পেয়ে যায়। আইনের রক্ষকই তো এ রাজ্যে আইনের ভক্ষক।

আসলে দিদি, আপনার কথা এখন আর কেউ শোনে না। ওই যে বললাম, ভাই থেকে ভাইপো সবাই অবাধ্য হয়ে উঠেছে। আমি শুধু আপনার অনুগামী। তাই পুলিশের কাছে আমার অনুরোধ, দিদির কথা শুনুন। কিন্তু দিদি যখন অন্যায় করতে বলবেন তখন কী কী করতে হবে সে সব বাপু আমি জানি না।

আপনি অনেক সময়েই পুলিশকে যে কোনো মামলা 'সাজাতে' নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দিদি অভিযোগ সত্য হলে সাজাতে হবে কেন। সত্য তো সাজগোজ করানোর জিনিস নয়।

অতিথি কলম

এম এ হোসাইন

বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিদের উত্থান ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নের স্পষ্ট সংকেত

বর্তমানে বাংলাদেশে যত দিন যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদের ছায়া ততই ঘনীভূত হচ্ছে। কারণ ইসলামি জেহাদি ছাত্র, যারা কথিতভাবে মহম্মদ ইউনুসের অনুগত তারা একটি সশস্ত্র মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করছে। এই মিলিশিয়া গঠন করা হবে 'ইসলামিক রেভলিউশনারি আর্মি' নামে। পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) এবং বহিঃশক্তির সমর্থনে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামক সংগঠনের নেতৃত্বে এই উদ্বেগজনক পদক্ষেপটি কেবল বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নয়, বরং ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার উপরও একটি বিপদ সংকেত।

২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষণা করেছে যে তারা 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি আর্মি'র জন্য নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ শুরু করবে। একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টে এই দলটি যুবকদের মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হতে আহ্বান জানিয়েছে, যা পরে সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের দ্বারা সামরিক প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত হবে বলে জানা গেছে।

আন্দোলনের নেতা আশিকুর রহমান জিম তিনদিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বাছাইকৃতদের নিয়ে মাসব্যাপী সামরিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। যার উদ্দেশ্য একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ মিলিশিয়া গঠন করা। এই মডেলটি অন্যান্য জেহাদি আন্দোলনের মতোই, বিশেষ করে ইউক্রেনে সিআইএ-মদতপুষ্ট মিলিশিয়াদের সঙ্গে মিল রয়েছে, যেখানে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী দলগুলো রাশিয়া সমর্থিত সরকারকে উৎখাত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তবে বাংলাদেশের এই মিলিশিয়াদের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে কেবল হিন্দু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভারতীয় স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য এগুলি গঠন করা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও মজহবি কট্টরবাদকে উসকে দিয়ে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ দেশে পরিণত করা, যা পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) এই মিলিশিয়া তৈরিতে ব্যাপকভাবে সক্রিয়। পাকিস্তানের স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপের (এসএসজি) পাঁচ জন অফিসার এই প্রশিক্ষণের তদারকি করতে দুবাই ও কাতার হয়ে ২০২৪ সালের নভেম্বরে ঢাকায় এসেছিলেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তারবেলা অঞ্চলে অবস্থিত এই এসএসজি 'ব্ল্যাক স্টর্কস' এবং 'মারুন বেরেটস' নামে পরিচিত। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, এসএসজি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজবুত তাহরির-এর ৩০০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে, যা খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সুবিধাজনক স্থানে পরিচালিত হয়। এই সদস্যদের বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা পেরিয়ে ব্যাচ আকারে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কার্যক্রম সরাসরি আইএসআইয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

আইএসআই-এর কৌশলের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে স্লিপার সেলের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। এই সেলগুলি সমাজে অনুপ্রবেশ করে এবং জেহাদি ছড়িয়ে দেশের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার একটি ডিজাইন। বাংলাদেশের বর্তমান এই তৎপরতা একটি বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা। হিযবুত তাহরির এদের মধ্যে অন্যতম ক্রিয়াশীল শক্তি। এই সংগঠনটি ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে সক্রিয়। বছরের পর বছর এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী এবং সুশীল সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। আইএসআইয়ের সহায়তায় সংগঠনটির সদস্যদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

হিজবুত তাহরির, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) এবং লস্কর-ই-তৈবা-র মতো অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ভীষণভাবে উদ্বেগজনক। এই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পাকিস্তানের কাছ থেকে লজিস্টিক সহায়তা পাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

আইএসআই বাংলাদেশের উর্দুভাষী মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী মনোভাব উসকে দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে থাকা উর্দুভাষী এই ক্যাম্পগুলি অস্ত্র পাচার, মাদক চোরাচালান এবং মানব পাচার-সহ অবৈধ কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কিছু অবসরপ্রাপ্ত ও চাকুরিচ্যুত আধিকারিকও এসব সংগঠনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

আইএসআই বাংলাদেশের উর্দুভাষী মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী মনোভাব উসকে দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে থাকা উর্দুভাষী এই ক্যাম্পগুলি অস্ত্র পাচার, মাদক চোরাচালান এবং মানব পাচার-সহ অবৈধ কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ৫০০০ জনকে জঙ্গি কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার সংখ্যা জুলাই নাগাদ ৫০ হাজারে পৌঁছেছে। বিস্ফোরক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত এই জঙ্গিরা থানায় হামলা চালিয়েছে, জেল ভাঙার মতো অপরাধে সহায়তা করেছে এবং জেল ও থানার অস্ত্রাগার লুঠ করেছে। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপগুলি অঞ্চলটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছে এবং জঙ্গি দলগুলির কর্মক্ষমতা বাড়িয়েছে।

এই জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থানের পেছনে পাকিস্তানের পাশাপাশি বহিঃশক্তিরও সমর্থনের অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন নেতা বারাক ওবামা, বিল এবং হিলারি ক্লিনটন, জর্জ সোরোসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'কে সকল ধরনের সহায়তা দিয়ে সমর্থন করার অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির সঙ্গে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাতের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে আইএসআইয়ের কৌশলটি আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে তার অতীতের কার্যক্রমেরই প্রতিফলন, যেখানে এটি তার ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করতে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করেছিল। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে পাকিস্তান মূলত বিশৃঙ্খলার একটি বাফার জোন তৈরি করতে চায় যা ভারতের আঞ্চলিক প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে সহায়ক হবে।

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ (নওয়াজ) (পিএমএলএন) দলের নেতা ইরশাদ আহমেদ খান এক প্রথমসারির ভারতীয় সম্প্রচার নেটওয়ার্কে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তান করাচি বন্দর থেকে সরাসরি জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে অস্ত্র চালান করেছে। এর পাশাপাশি আরও উদ্বেগজনক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, পাকিস্তান, যে দেশটি নিজ নাগরিকদের জন্য চিনি-সহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ, তারা সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাংলাদেশে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বস্ত গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানি নেটওয়ার্কগুলি চিনির রপ্তানির আড়ালে বিপুল পরিমাণ হেরোইন, কোকেন ও সিনথেটিক ওপিওয়েড বাংলাদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। এই মাদকগুলি ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মাদক চোরাচালানের প্রভাব বিশাল। বিশেষ করে ভারতীয় যুবসমাজ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ মাদকের প্রবাহের ফলে আসক্তির হার বৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দেবে। তদুপরি, এই অবৈধ মাদকের চালান ভারতীয় এজেন্টদের মাধ্যমে পশ্চিমি দেশগুলিতে পাঠানো হতে পারে, যা বৈশ্বিক মাদকবিরোধী লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলবে।

যদি এই পাচার হওয়া মাদক বিভিন্ন দেশে আটক করা হয়, তবে এটি ভারতের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যার ফলে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির উপর কড়া নজরদারি শুরু করতে পারে আন্তর্জাতিক মহল। যার ফলে ভারতের অর্থনীতি এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসা- বাণিজ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। এমন একটি ফলাফল পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে রূপ দেবে, সেখানে প্রতিবেশী দেশকে অস্থিতিশীল করার পাশাপাশি মাদক বাণিজ্য থেকে লাভবান হওয়ার কৌশলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশে পাকিস্তানি নাগরিক বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের প্রবেশের জন্য আগের নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড় পত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহারের সুবিধা নিয়ে পাকিস্তানের আইএসআই-তেহরিক-ই- তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর জঙ্গিদের বাংলাদেশে প্রবেশে সহায়তা করছে। এরা ব্যবসায়ী, পর্যটক, বা তবলিগ জামাতের সদস্যদের ছদ্মবেশে প্রবেশ করছে। শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, আইএসআই ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত হিযবুত জাহরির সদস্যদেরও ভারতে পাঠানো শুরু করেছে।

সশস্ত্র অপারেশন ছাড়াও,; বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি তাদের সাইবার যুদ্ধের দক্ষতাও বাড়াচ্ছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো ভিন্নমতকে স্তব্ধ করতে এবং অপপ্রচার ছড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে টার্গেট করছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা সম্প্রতি মিথ্যা কপিরাইটের অভিযোগ দায়ের করে একজন ভারতীয় সাংবাদিকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সরিয়ে দিতে সফল হয়েছে। 'ইসলামিক রেভলিউশনারি আর্মি' গঠন এবং জঙ্গি দলগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অস্তিত্বের জন্য একটি বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে, বিশেষ করে ভারতে এদের সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

এই ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রয়েছে। প্রথমত, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, যাতে জঙ্গি কার্যকলাপ ও অবৈধ পণ্যের চলাচল রোধ করা যায়; দ্বিতীয়ত, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জেহাদি কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি ও প্রতিরোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে জঙ্গি মনোভাবের কারণগুলো মোকাবিলা করা; এবং চতুর্থত, সন্ত্রাসে আর্থিক মদতদাতা ব্যক্তি ও সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যা তাদের কার্যক্রম ব্যাহত করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের উত্থান আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নের এক স্পষ্ট নিদর্শন। 'ইসলামিক রেভলিউশনারি আর্মি' গঠনের ঘটনাটি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এশীয় সংগ্রামের একটি নতুন পর্ব চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তান এবং অন্যান্য বহিরাগত শক্তির কাছ থেকে সমর্থন-সহ এই পদক্ষেপগুলো দক্ষিণ এশিয়াকে অস্থির করার এবং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করার ল্যাবরেটরি হয়ে উঠছে।

(লেখক একজন রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া গ্রামীণ জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডলের অগ্রজ প্রভাত মণ্ডল গত ৯ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

ওপারের হিন্দু বাঙ্গালির নিধনে এপারের বাঙ্গালি আজ এতো বিচলিত কেন?

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর কীরকম অত্যাচার চলছে, এতদিনে সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখছেন না তথ্যাভিজ্ঞ মহল। কারণ ইসলামিয় দেশে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এটাই ভবিতব্য। অতীতেও এজিনিস হয়েছে, ভবিষ্যতেও যদি আদৌ হিন্দু বলে কিছু থাকে বাংলাদেশে তবে হয়তো এটাই ঘটে চলবে। ঠিক যেমনটি পাকিস্তানে হয়েছে। আসলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে বেজায় পিলে চমকেছে বাঙ্গালির। বাঙ্গালি এতদিন জানতো এপার বঙ্গ, ওপার বঙ্গ ভাই ভাই। নেহাত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাই বাঙ্গালি আলাদা হয়েছে। নয়তো বাংলাদেশে হিন্দু বাঙ্গালি-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নতুন কিছু নয়।

প্রতিবার দুর্গাপূজার সময় এপার বঙ্গে যখন আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠে, ওপার বঙ্গে তখন চলে হিন্দু বাঙ্গালির ওপর ভয়ংকর অত্যাচার। মহিলাদের ওপর নারকীয় অত্যাচার, প্রতিমার মূর্তি ভেঙে দেওয়া, তাকে নানাবিধ পদ্ধতিতে অসম্মান, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ভয়ংকর সব অত্যাচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দুদের যখন 'এথনিং ক্লিনজিং' অর্থাৎ বাংলাদেশকে 'হিন্দুশূন্য' করার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এপারের হিন্দু তখন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল। সাম্প্রতিককালে সোশ্যাল মিডিয়া সক্রিয় হওয়ার পর, কিংবা তারও আগে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ মোহিত রায় এবং অন্যান্যদের 'ক্যাম্ব' (সিএএএমবি বা ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনোরিটিজ ইন বাংলাদেশ) বলে একটি সংস্থা বাংলাদেশে হিন্দুদের অবর্ণনীয়, শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ্যে আনে। এই শতকের প্রথম দশকে দক্ষিণ কলকাতায় ক্যাম্বের কয়েকটি সম্মেলনও হয়েছিল মনে পড়ে, কিন্তু এপারের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি তখনো 'দুই বঙ্গ একই' মোহনিদ্রায় আক্রান্ত থেকে ওসব 'সাম্প্রদায়িক প্রচার' বলে সত্যবিমুখ হয়েছিল। তাই সাম্প্রতিক ঘটনায় তাদের এতো ঝটকা লেগেছে। এমনকী বাংলাদেশে যখন জুলাই-আগস্ট মাসে আগুন লাগানো শুরু হয়েছিল, তখনো কমিউনিস্ট শিক্ষাধারায় আপ্লুত এপারের হিন্দু বাঙ্গালি 'বিপ্লবে'র স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রশাসনিক উচ্ছৃঙ্খলতার নামে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ দেখেও নাকে-কানে ঠুলি এঁটে বসেছিল।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এপারের হিন্দু বাঙ্গালির অবশ্য হিন্দুত্বের চেতনা পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের 'মুসলমান তোষণ' দেখে ফিরে আসছিল। বিশেষ করে ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিরোধী দলের বিধায়করা দুর্গাপূজার সময়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে বিধানসভা চত্বরে মোমবাতি মিছিল করলে এপারের হিন্দু বাঙ্গালি বাংলাদেশের ব্যাপারে কিছুটা তবু সজাগ হয়েছিল।

> "ইতিহাসের শিক্ষা নিয়েই এপারের হিন্দু বাঙ্গালিকে এবার সজাগ হতে হবে। নয়তো ওপারের আপামর হিন্দু বাঙ্গালির ভবিতব্য এপারের হিন্দু বাঙ্গালির কপালে জুটবে।"

এপারের হিন্দু বাঙ্গালি এ বাপারে ক্রমশ সচেতন হচ্ছে, বুঝতে পেরেই 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র মহান কারবারিরা প্রমাণিত সত্য বঙ্গাব্দের প্রবর্তক রাজা শশাঙ্ক নয়, আকবর বলে প্রচার করে দিলেন। ইতিহাস-সত্য মুঘল বাদশা আকবর ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে অব্দি রাজত্ব করেন। তেরো বছর বয়সে তিনি মসনদে বসেন। অর্থাৎ ৬৮১ বছর আগে জন্মানো ব্যক্তি ১৪৩১ বছরের বাংলা সালতামামি কোনো গাণিতিক নিয়মে আবিষ্কার করলেন, তা বোঝাতে গিয়ে চান্দ্রমাস, সূর্যমাস ইত্যাদি হাবিজাবি গোঁজামিল বুঝিয়ে তখনো এপারের বাঙ্গালিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পাঠ শেখানো চলছিল।

কিন্তু ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর গ্রেপ্তারি সব হিসেব ঘেঁটে দিল। এপারের হিন্দু বাঙ্গালি আজ উপলব্ধি করতে পারছে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাঙ্গালি হওয়া যায় না। '৫২ কিংবা '৭১-এর ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র কর্তৃত্ব দখলের লড়াই, তার সঙ্গে বাঙ্গালিয়ানার কোনো যোগ নেই। হ্যাঁ, একথা অনস্বীকার্য, বাঙ্গালির জাতিসত্তা হলো ভারতীয় জাতিসত্তা। সেই জাতিসত্তা যার মধ্যে আছে সেই ভারতীয় সেনা সেদিন বাংলাদেশ নামক নতুন দেশের জন্মের জন্য প্রাণপাত করেছিল। আজ তার প্রতিদান ওপারের জেহাদি মুসলমানরা খুব ভালো মতোই দিচ্ছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা নিয়েই এপারের হিন্দু বাঙ্গালিকে এবার সজাগ হতে হবে। নয়তো ওপারের আপামর হিন্দু বাঙ্গালির ভবিতব্য এপারের হিন্দু বাঙ্গালির কপালে জুটবে। □

বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে দু'পারের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

আমার প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণ অন্তত তিরিশ বছর আগে। তখন ছাত্র ছিলাম। একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ওই দেশে যাই। যশোর, খুলনা, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি একাধিক শহরে নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝেই তখন বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের বাড়ি লুঠ, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজির ঘটনা শোনা যাচ্ছে। তখন বাংলাদেশের শাসক হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। আয়োজকদের সঙ্গে তার আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। আবার আয়োজক সংগঠনের সভানেত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত দহরম মহরম। সবটাই কেমন একটা রহস্যজনক। বয়সে ছোটো, যা দেখছি তা তখন ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। হিন্দু পরিবারগুলো সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে। সংগঠনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে মিলমিশ ওপর ওপর। গভীরে ভয়ংকর ক্ষত। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। প্রতিটি জায়গাতেই সম্প্রীতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাহিত্য সভার আয়োজন ছিল।

বেশ মনে আছে কবি, সাহিত্যিকদের আলোচনায় বার বার উঠে এসেছিল কলকাতাকে না পাওয়ার বেদনা। কলকাতা ছাড়া বাংলাদেশ একটি অসম্পূর্ণ দেশ— এই হতাশা তাদের গ্রাস করেছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকার প্রভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, দুই জার্মানি একত্রিত হয়েছে, জোর গুজব দুই কোরিয়াও নাকি এক হয়ে যাবে। সেই সময়ে বাম বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একত্রিত হয়ে প্রচার চালাতে থাকে দুই বঙ্গও জুড়ে যাক। একটি বৃহৎ 'বাংলাদেশ' গড়ার সলতে পাকানোর কাজ প্রকাশ্যে চলেছে। সে সময় সে দেশের বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিকদের সঙ্গে না মিশে মনে হয়েছিল সমবয়সিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই। অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, তরুণ-যুবকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কোনো চেতনা নেই। সকলেই তীব্র ভারত বিদ্বেষী। ওদের পরিষ্কার বক্তব্য, আমার ভাই (পাকিস্তান)-এর সঙ্গে আমার বিবাদ, তাতে ভারতের নাক গলানোর দরকার কী? আমাদের বিবাদ আমরাই মিটিয়ে নেব।

> "আন্তর্জাতিক মহলকে বোঝাতে হবে বাংলাদেশের ভাষা বাংলাদেশি, পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী মানুষদের ভাষা বাংলা।"

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নামে গত আগস্ট মাসে যেভাবে বাংলাদেশ জুড়ে জেহাদি অভ্যুত্থান, তা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা কোনো আন্দোলন ভাবলে খুব ভুল ভাবা হবে। মাটি তৈরিই ছিল। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ— দেশের নাম যাই হোক না কেন, মূল পরিচয় ভারত বিদ্বেষ। আবার এই বিদ্বেষের মূল কারণ হিন্দু। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা হিন্দুদের জন্য শুধুমাত্র হুমকি নয়। বরং বলা যেতে পারে কাঁটাতারের দু'দিকের মানুষেরই হিন্দু বাঙ্গালি সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার একটা চ্যালেঞ্জ। একতিরিশ বছর আগের এক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। চৈত্রের শেষ রাতে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিরোনাম চমৎকার— 'বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব'। নাম শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বাংলা ক্যালেন্ডারের চোদ্দশো বছর পার করে চোদ্দশো এক বছরে পদার্পণের প্রাক মুহূর্ত। সারা রাতব্যাপী সংগীত-নৃত্য-বাদ্য-আবৃত্তির উৎসব। যতদূর মনে পড়ছে আয়োজক কমিটির মাথায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। আমন্ত্রণপত্রে রয়েছে এপার ও ওপারের বামমনোভাবাপন্ন প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিকের নাম। এছাড়াও আছেন সেই সময়ের এক আনন্দবাজারি সাংবাদিক এবং এক জব্বর সিপিআই নেতা। অনুষ্ঠান মঞ্চে হঠাৎই দাবি উঠল দুই বঙ্গকে এক করার। আবেগে আপ্লুত হয়ে উপস্থিত কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষ উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

কলকাতা-সহ সম্পূর্ণ বঙ্গ পাকিস্তানের দখলে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল জিন্না ও অন্যান্য পাক নেতাদের। হত্যা, লুণ্ঠন, দাঙ্গা, কিনা হয়েছে। পাশাপাশি শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়েদের দিয়ে সংযুক্ত বঙ্গের প্রস্তাব। যাতে পরে সুযোগ বুঝে তাকে পাকিস্তানের করায়ত্ত করা যায়। কিন্তু মুসলিম লিগের সমস্ত আশায় জল ঢেলে এই সমস্ত পরিকল্পনাতে বাদ সেজেছিলেন সেদিন এক বাঙ্গালি। তাঁর নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যাঁর নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস-সহ সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় সেদিন বঙ্গভূমির পশ্চিমপ্রান্তে গড়ে ওঠে বাঙ্গালির নিজস্ব বাসস্থান---

পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু হাল ছাড়েনি কুচক্রীরা। তাই সোভিয়েত পতনের পর বিশ্ব রাজনীতির অসম্ভব টানাপোড়েনে দুই বঙ্গ এক করার আবেগে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল আরবীয় সাম্রাজ্যবাদ। এই ষড়যন্ত্রের দোসর কমিউনিস্টরা হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সময় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন দুই বঙ্গ এক হবে, এটা ভালো কথা। কিন্তু তা কি ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে? এই প্রশ্নে আয়োজকেরা ছিলেন নীরব। ভুললে চলবে না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি সব দেখছেন, শুনছেন এবং জল মাপছেন।

অনেকে বলছেন, বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, বাংলাদেশ কী আদৌ কোনোদিন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ কখনো ছিল? পাট অর্থনীতির বখড়ায় টান পড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা ভারতের সামরিক সাহায্য ব্যবহার করেছিল। ক্ষমতালোভী মুজিব সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ভারত বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত। রবীন্দ্রনাথ কোনো এক আফগান নাগরিকের মধ্যে হয়তো মানবিক কোনো আচরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আমাদের বেদনা দেয়। তবে কলকাতার এক তরুণীর জনৈক কাবুলিওয়ালার প্রেমে পড়ে কী অবস্থা হয়েছিল তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের চরিত্রে এমন মানবিক অবস্থান কী আমরা কখনো দেখতে পেয়েছি? নিজেদের মেয়ে তসলিমা নাসরিন সত্য কথা বলার জন্য দেশ থেকে নির্বাসিতা। একাধিক ব্লগার, মুক্তমনা বিদেশে পালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা দেখে তাই আমি মোটেও অবাক হইনি। কারণ এটাই হওয়ার ছিল। পঁচাত্তর বছর ধরে এরা জমি তৈরি করেছে। ওই সময়ের পর আমি একাধিকবার বাংলাদেশ গিয়েছি। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা— বাংলাদেশের নৈতিক চরিত্র। যারা বাংলাদেশের সাহিত্যের সুনাম করেন তারা জানেন না যে বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকদের গল্প ভারতীয় লেখকদের থেকে টোকা। চুরি বিদ্যায় এরা এত হাত পাকিয়েছেন যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নিজের বলে চালিয়ে দেন। তাই ঢাকা বইমেলায় ভারতের ঢোকা বারণ। ঢুকলেই তো সব ধরা পড়ে যাবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি একাধিকবার অভিযোগ করেছিলেন যে তার লেখা প্রায় সমস্ত ছোটো গল্প বাংলাদেশি লেখকরা নিজের বলে চালিয়ে যাচ্ছে। চুরি যে এদের মজ্জাগত সেটা তসলিমার 'লজ্জা' পড়লেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশ গঠনের মূল লক্ষ্য বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালির সংস্কৃতি দখল করা। ১৯৫৫ সালে মহম্মদ শহীদুল্লাহের নেতৃত্বে বাংলা অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছিল ভাষা সংস্কারের জন্য। এরা প্রথমে বানানের সংস্কার শুরু করে। বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রাকৃত শব্দের দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঊ-র পরিবর্তন ঘটিয়ে সব হ্রস্ব শব্দে পরিবর্তন করে। শুরু হয় লিপির সংস্কার। যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া, বর্ণমালার পরিবর্তন করা— কতকিছু যে এরা করেছে, তার হিসেব নেই। বর্ণমালার প্রতিটি লিপি আসলে মহাকালীর গলায় এক একটি মুণ্ড। বর্ণমালা পরিবর্তন করার মূল উদ্দেশ্য এটাই। হিন্দু সংস্কৃতি থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করা। এরপর শুরু হয় অপ্রয়োজনীয় আরবি শব্দের অন্তর্ভুক্তি।

বাঙ্গালি সংস্কৃতির অন্যতম অবদান বাংলা ক্যালেন্ডার। মহারাজা শশাঙ্কের শাসনকালেই প্রাচীন ভারতের সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হয় বঙ্গাব্দের পথ চলা। বাঙ্গালির অসামান্য স্বীকৃতিকে নিজেদের কবজায় আনতে মধ্যযুগের মুঘল শাসক আকবর এই বঙ্গাব্দের প্রচলন করে বলে মিথ্যা প্রচার করে। মাত্র পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই মুঘল বাদশা কী করে দেড়হাজার বছর আগের পঞ্জিকার প্রচলন করবে তা নিয়ে বাঙ্গালি প্রশ্ন তুলল না। নোবেল স্মারকজয়ী অমর্ত্য সেন টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এই দাবির পক্ষে জোরদার প্রচার শুরু করে দিলেন। তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী যেভাবে বাংলা মাসের হিসেব হয়, তার পরিবর্তন করে ইংরেজির ৩০/৩১-এর মতো করে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের গণনা শুরু করে। এজন্য বাংলা মাসের দিন অনুযায়ী কোনো উৎসব, যেমন ২৫ বৈশাখ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দিন মেলে না। আর এই বছর তো কবিগুরুর মূর্তিই সেই দেশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৬ সালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি তৈরি হয়। নিন্দুকেরা বলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ঢাকাস্থিত বাংলা অ্যাকাডেমির কার্যকর সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করা। এরাও নানাভাবে বাংলা বানান, লিপির পরিবর্তন শুরু করে দেয় এবং মধ্যশিক্ষা পরিষদের পুস্তকে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। বেশ মনে আছে বাংলা বানান ও লিপির এই সংস্কার কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকেরা মেনে নেয়নি। ডিটিপি শিল্পীরা তখন কোনো কাজ করাতে গেলে বলতো কোন বানান নেবেন সরকারের না কি কলেজ স্ট্রিটের? রামধনুকে রংধনু করে তোলা বা 'রাম' শব্দের অর্থ ঘুরে বেড়ানো এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ। কম্পিউটারে বাংলা লেখা এখন একটা ঝকমারি। আরও ঝকমারি গুগল থেকে কেউ যদি বাংলা অনুবাদ করেন।

এ সবই কিন্তু দখলদারী মানসিকতার ছোটো ছোটো পদক্ষেপ। ভারতকে গাজওয়াতুল হিন্দ বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক দিন ধরে। কুসুম সংস্কৃতির আড়ালে জামাত, হেফাজত ইসলামি, উলেমা, উলেমা লিগ, পির, হুজুর, ওয়াজি, মাদ্রাসার ছাত্র, ছাত্র শিবির, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সমস্ত ইসলামি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এদের আনাগোনা। এরা সবাই সন্ত্রাসবাদী। বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভারতের প্রতিবেশী দেশ নয়। বাংলাদেশি ভাষার কথা বলা জনগোষ্ঠীর দেশ। বিশ্বে বাঙ্গালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে দখল করার এই আগ্রাসনী মনোভাবের প্রতিকার করার জন্য আমাদের কোমর বাঁধতে হবে। আন্তর্জাতিক মহলকে বোঝাতে হবে বাংলাদেশের ভাষা বাংলাদেশি, পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী মানুষদের ভাষা বাংলা। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বিরুদ্ধে আর এক লড়াই হলেই বাঙ্গালি বাঁচবে, নচেৎ নয়। □

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতন ও ভারতবিদ্বেষ
অর্থনৈতিক যুদ্ধই একমাত্র প্রতিকার

অম্লান কুসুম ঘোষ

ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এখন অশান্ত। প্রতিনিয়ত সেখান থেকে একের পর মানবতা লাঞ্ছিত হওয়ার মতো ঘটনার খবর আসছে। সেখানকার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বিতাড়িত, অন্ধ ভারত বিদ্বেষীদের হাতে সেখানকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত, সাধারণ মানুষ চরমভাবে আক্রান্ত, নির্যাতিত, বাড়িছাড়া এবং এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতকেও।

এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত করে চলেছে। তার ওপর বর্তমানের এই নবসৃষ্ট মধ্যযুগীয় পরিস্থিতি বাংলাদেশকে আরও সংকীর্ণ মানসিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে ভারতকে। কারণ বাংলাদেশের বর্তমানে যা অবস্থা তা সভ্য জগতের কল্পনাতীত। সেখানকার সাধারণ মানুষের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালানো এবং ভারত বিরোধী নানারকম কার্যকলাপের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি পর্যন্ত তারা চূর্ণ করেছে, এমনকী ভারতের জাতীয় পতাকার ওপর পা রেখে তার ছবি সর্বত্র ছড়িয়েছে। ভারতীয় হিসেবে এই ঘটনা আমাদের প্রত্যেককে পীড়া দেয়।

অবশ্য বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নির্যাতন আজ প্রথম হচ্ছে তা নয়, এই নির্যাতন চলে আসছে ১৯৪৬ সাল থেকে। ১৯৪৬ সালে, দেশভাগ হওয়ারও বছরখানেক আগে যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের ওপর, তা সেই সময়কার সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের কপালেই ফেলেছিল দুশ্চিন্তার ভাঁজ। নোয়াখালি নরহত্যার পরে তারই সূত্র ধরে দেশজুড়ে আক্রমণ হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের ওপর এবং তারই ফলশ্রুতিতে দেশভাগ হয়েছিল। দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার আরও বেড়েছিল।

বাধ্য হয়ে সেখানকার হিন্দু সমাজ নিজেদের পরিশ্রমে তিল তিল করে তৈরি করা সমস্ত সম্পদ ইসলামি জেহাদিদের হাতে তুলে দিয়ে মানসম্ভ্রম খুইয়ে, একবস্ত্রে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষও ইসলামি জেহাদিদের আক্রমণের সাক্ষী থেকেছে। যারা দেশ ভাগ করে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছিল, তারা পশ্চিমবঙ্গকেও পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেদিন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করেছিলেন তাদের করাল গ্রাস থেকে। তাইতো শরণার্থীরা শরণ নেবার মতো একটি রাজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ৪৭ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৫৫, ৫৫ থেকে ৬৫, ৬৫ থেকে ৭১ পাকিস্তানের বাঙ্গালি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল আর দলে দলে ছিন্নমূল মানুষেরা উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে।

তারপর একাত্তরে এসেছিল সেই কুখ্যাত অধ্যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম গণহত্যা বা জেনোসাইডের মধ্যে অন্যতম ছিল একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা। পাকিস্তানের খান সেনারা চালিয়েছিল সেই গণহত্যা এবং তার মূল শিকার ছিল হিন্দুসমাজ। সেই গণহত্যার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে, খান সেনাদের হটিয়ে বাংলাদেশ নামক নতুন দেশের জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের জীবন দাতা বলা যেতে পারে। কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশের এই জেহাদিরা যে তারা ভারতের এই উপকার ভুলে গেছে এবং ভারতের সঙ্গে চরম শত্রুতা করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান হয়েছে তাদের নতুন দোস্ত। অর্থাৎ বলা যায় তারা

শুধুমাত্র অকৃতজ্ঞ নয় বরং কৃতঘ্ন। তাদের এই কৃতঘ্নতার আরও নিদর্শন রয়েছে। বর্তমানে তারা যখন চরম ভারত বিরোধিতা ও হিন্দু বিরোধিতা প্রদর্শন করছে সেই সময়ও তারা অর্থনৈতিক ও চিকিৎসাগত দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষেই তারা এখনো ভারতের অন্নে পালিত এবং একইসঙ্গে ভারত বিরোধিতায় চরমভাবে প্রণোদিত।

বাংলাদেশের যে কটি শিল্প তাদের অর্থনীতির স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয় সেই শিল্পগুলির কাঁচামাল যায় ভারত থেকেই, যেমন বস্ত্রবয়ন শিল্প বা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আমদানিকারক এই শিল্পটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের তুলোর উপরই নির্ভরশীল। ভারত যদি তুলো পাঠানো বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের এই শিল্পটি তো বন্ধ হয়ে যাবেই উপরন্তু তাদের ছেড়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে নেবে ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্প তাতেই বাংলাদেশের সর্বনাশ হবে এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে। এছাড়াও সমস্ত রকম খাদ্যবস্তু ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ভারত থেকেই বাংলাদেশে যায়। ভারতের রপ্তানিকারকেরা যদি সামগ্রিকভাবে বয়কট করেন বাংলাদেশকে, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু নয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ধ্বসে যাবে। বাংলাদেশে পেট্রলিয়ামও যায় ভারত থেকেই, ভারত পেট্রলিয়াম পাঠানো বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের একটা গাড়িও চলবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চারদিকে সীমানা বরাবরই ভারতের অবস্থান, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলপথে আমদানি করতে গেলে তার খরচ অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের কাছে ভারতের কাছে হাত পাতা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত হওয়ায় তাদের বেশিরভাগই চিকিৎসা করাতে আসে ভারতে। ভারত যদি মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ করে দেয় তাহলে তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়বে। বাংলাদেশের যে জেহাদিরা ভারতবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং ওখানকার হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে, তারা যখন নিজেদের চিকিৎসা করানোর জন্য ভারত আসতে পারবে না, তখন তারাই ভারতের সামনে নতমস্তক হবে। এখন তাই এই সংকটকালে বাংলাদেশের এই দুর্বলতার দিকেই আমাদের আঙুল তুলতে হবে, আমাদেরকে দেশের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে ভারত বিরোধিতা করলে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করলে তার ফল কত ভয়ংকর হতে পারে। বাংলাদেশের অত্যাচারী শক্তির উপর এভাবে অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবাগত চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তারা হয়তো বাধ্য হয়ে তাদের অত্যাচার বন্ধ করবে, রক্ষা পাবে সেখানকার হিন্দু সমাজ। আধুনিক যুগে অস্ত্রের যুদ্ধ ধীরে ধীরে অতীত হতে বসেছে। অর্থনীতির যুদ্ধই আজকের যুগের প্রধান যুদ্ধ মাধ্যম আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে বিশ্বব্যাপী যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তা হচ্ছে অর্থনীতির যুদ্ধ, যে অর্থনীতির যুদ্ধ আজকের দিনে অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী, অর্থনীতির মার আজকের দিনে অস্ত্রের মারের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। তাই আজ ভারতবাসীকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই অর্থনীতির যুদ্ধই লড়তে হবে।

এছাড়াও বাংলাদেশের ছোটোখাটো বিভিন্ন সামগ্রী ভারতের বাজারে বিক্রি হয়। আমরা ভারতীয়রা সেসব জিনিস কিনে থাকি। অর্থ প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের সেই জেহাদিদের হাতই শক্ত করে। অর্থাৎ ভারতবিরোধী এই সমস্ত কাজই তারা করছে ভারত থেকে প্রাপ্ত অর্থে বলীয়ান হয়ে। ভারতে আমরা যে সমস্ত বাংলাদেশি পণ্য কিনছি তারই লভ্যাংশ থেকে অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশি মোল্লাবাদীরা এই সমস্ত অপকর্ম করতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের পকেটের টাকা থেকে বলীয়ান হয়ে তারা আমাদেরই বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে। তাই আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে বসবাসকারী আমাদের হিন্দু ভাই-বোনদের বাঁচানোর জন্য, আমাদের দেশ ভারতকে বাংলাদেশের মোল্লাবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে শুধুমাত্র মানবতার খাতিরেই তার প্রতিবাদ করার জন্য, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে যে জঘন্যতম অপরাধ তারা করেছে বাঙ্গালি হিসেবে তার প্রতিবাদ করার জন্য এবং ভারতের জাতীয় পতাকার ওপর পা রেখে তারা ছবি তুলে সেই ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে যে জঘন্যতম অপরাধ তারা করেছে, ভারতীয় হিসেবে তার প্রতিবাদ করার জন্য কতগুলি পথ অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. সবরকম বাংলাদেশি পণ্য পরিষেবা বয়কট করতে হবে। শপিংমল হোক বা ফুটপাথ কোনো জায়গা থেকেই কোনো রকম বাংলাদেশি পণ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকতে হবে। ২. কোনো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে কোনো কাজ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। গৃহ সহায়ক বা সহায়িকা থেকে শুরু করে রাজমিস্ত্রি, গাড়ির মেকানিক, কল বা ইলেক্ট্রিকের মেকানিক ইত্যাদি সমস্ত রকম কাজ যখন কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, তখন অবশ্যই তার আধার/ভোটার কার্ড ইত্যাদি দ্বারা তার নাগরিকত্ব যাচাই করে নিতে হবে। ৩. ইউটিউব বা কোনো রকম সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের ওয়েব সিরিজ দেখা বন্ধ করতে হবে। ৪. ভারতীয় আমদানিকারকদের ও ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করতে হবে, সব রকম বাংলাদেশি পণ্য আমদানি ও বিক্রয় করা বন্ধ রাখতে হবে। ৫. ভারতের রপ্তানিকারকদের কাছে অনুরোধ করতে হবে, ভারত থেকে বাংলাদেশে যে কোনো রকমের কাঁচামাল বিশেষত তুলো পাঠানো বন্ধ করা হোক তাতে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বসে যাবে এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আরও উন্নত হয়ে যে আন্তর্জাতিক বাজার এখন বাংলাদেশের হাতে আছে সেই আন্তর্জাতিক বাজার দখল করতে পারবে। ৬. ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানাতে হবে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও বাংলাদেশের লোকেদের ভারতে মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া বন্ধ রাখা হোক।

এইভাবেই বাংলাদেশি জেহাদিদের ভাতে মারতে হবে, খেতে না পেয়ে যখন শুকিয়ে মরবে, তখনই তাদের জেহাদ বন্ধ হয়ে যাবে। ◻

বাংলাদেশে মানবতা লঙ্ঘনের ঘটনায় বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলি চুপ কেন?

কানু রঞ্জন দেবনাথ

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৮৩তম সভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সনদ হলো মানব অধিকারের একটি মৌলিক পাঠ্য বা ঘোষণা। এটাকে 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস' সংক্ষেপে ইউডিএইচআর বলে। বাংলায় এটাকে বলা যায় 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এটা একটা আন্তর্জাতিক দলিল যা সমস্ত মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংহত করে। এইজন্য প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালিত হয়। মানবাধিকার হলো মানুষের মৌলিক সার্বজনীন অধিকার— যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক প্রকারের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ মাত্রই এই অধিকার ভোগ করবে এবং অনুশীলন করবে। তবে এই অনুশীলন অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের যেন কারণ না হতে পারে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সমানভাবে প্রযোজ্য। এই অধিকার একই সঙ্গে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হলো এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটসের ১ম অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে, 'অল হিউম্যান বিংস্ আর বর্ন ফ্রি অ্যান্ড ইক্যুয়েল ইন ডিগনিটি অ্যান্ড রাইটস'— অর্থাৎ জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

বহুদিন ধরেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিপীড়ন, নৃশংসতা এবং টার্গেট কিলিঙের শিকার হচ্ছে। ভারতে তথা বিশ্বের মধ্যে যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা কি এসব নৃশংসতা দেখতে পাচ্ছেন না? তারা নিশ্চয় এগুলি দেখতে পাচ্ছেন বা শুনতে পাচ্ছেন। পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং এখন বাংলাদেশে বহু বছর ধরে হিন্দুদের বা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন কি তাদের মনে সংবেদনা সৃষ্টি করতে পারে না? এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে ভাবতে হবে এবং আলোচনা করতে হবে, শুধু কয়েকটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে ঠিক হবে না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন কি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের বা জাতির জন্য প্রযোজ্য? পাকিস্তান, আফগানিস্তান ছাড়া বাংলাদেশে আজকাল কী ঘটছে? পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো ঠিক একই লাইনে সেখানে হিন্দুদের নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে— তা নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি চিন্তা করছে না কেন? বাংলাদেশের জেহাদিরা হিন্দুদের সরাসরি টার্গেট করেছে। হিন্দুদের মন্দির, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর ধ্বংস করছে। অথচ মানবাধিকার সংগঠনগুলি ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ সেজে চুপ করে বসে আছে। মনে হয় তারা যেন এসব জানেই না বা জানলেও এগুলি তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

যদি মানবাধিকার সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধি করার কথা ওঠে, কিংবা মানবাধিকার সংগঠনগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার কথা ওঠে, তাহলে অবশ্যই তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র, দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে হবে।

এমনকী ছোটো শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী বা নারীরাও রেহাই পাচ্ছে না। নিরীহ পশুকেও রেহাই দিচ্ছে না। ইসকনের আশ্রমের গোরুগুলির ওপর নির্মম অত্যাচারের ভিডিয়ো আজকাল ভাইরাল হয়েছে। দেশটির সরকার সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দায়িত্ব না দিলে সেই দায়ভার আর কে নেবে? বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে যে যেখানে জেহাদিরা সংখ্যালঘু বা হিন্দুদের বাড়িঘর, ব্যবসা এবং উপাসনালয়ে সরাসরি

আক্রমণ করছে, অথচ কাউকে জবাবদিহি করা হচ্ছে না। এমনকী সমস্ত হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচও এই নির্মম অত্যাচার ও হত্যার বিরুদ্ধে কথা বলছে না। বললেও অত্যন্ত দায়সারা ভাবে এক-দুটা কথা বলছে। কথাটি এমনভাবে বলছে যে বাংলাদেশের ঘটনার চেয়ে তাদের কাছে ভারতের মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা ও উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এত ঘটনা ঘটলেও তাদের কাছে প্রধান বা মুখ্য ব্যাপার হয়ে দেখা দেয় ভারতের দোষ অনুসন্ধান। ভারতের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপরেই তাদের যত দৃষ্টি। বাংলাদেশের হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণকারী অপরাধীদের এখনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিবাদ আন্দোলন করছিলেন, সেই চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে বিনা অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি যাতে সহজে জেল থেকে ছাড়া না পেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। যে উকিলরা চিন্ময় প্রভুর হয়ে লড়াই করছেন, তাদের কয়েকজনকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে মেরে ফেলার মতো পরিস্থিতি করছে, আর বাকিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মারাত্মক অভিযোগ এনে জেলে পুরেছে, না হয় ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ঘরের মধ্যেই বন্দি করে রেখেছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান কালে চলমান হিন্দুদের প্রতি মানবাধিকারের নমুনা। তথাকথিত হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের সদস্যদের কাছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো আন্দোলন বা প্রতিবাদ নজরে আসছে না। তাদের চোখে ইজরায়েলে মানবাধিকার নেই! ভারতে মানবাধিকার নেই! ১০ হাজার মাইল দূরে আমেরিকার কোনো এক শহরে কোনো একজন কৃষ্ণাঙ্গ মারা গেলে, সেখানে মানবাধিকার নেই। কিন্তু জেহাদি হামাস মারা গেলে মানবাধিকার জেগে ওঠে। এরকমভাবে যদি মানবাধিকার কমিটিগুলি কাজ করে চলে তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে এই সংগঠনগুলির গ্রহণযোগ্যতা, সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হতেই পারে।

বাংলাদেশের হিন্দুরা গত ৫ আগস্টের পর থেকে এই বর্বরতা ও নাশকতার বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিবাদ করে আসছিল, কিন্তু নোবেল শান্তিপুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস শুধু সংখ্যালঘুদের দুর্দশাকে উপেক্ষাই করেনি বরং হিংসা সৃষ্টির অপরাধীদের আড়াল করতেও সচেষ্ট হয়েছে। এখনও অনেক জায়গায় প্রতিদিন অত্যাচার হয়ে চলেছে। দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকী মানবাধিকার সংস্থাগুলোও বাংলাদেশের এই হিন্দু সংখ্যালঘুদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তারা জানার চেষ্টা করছে না, কীভাবে অপরাধীরা হিন্দুদের উপাসনালয়ে, তাদের পরিবার-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে হামলা হচ্ছে? সরকার কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর এত হিংসা কেন? আজ অবধি বাংলাদেশের হিন্দুদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

একেবারে নীচু থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনার জন্য ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তির শাসনেই হিন্দুরা আজ সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। কুটিল মানসিকতার মানুষ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য? সেই নোবেল শান্তি পুরস্কার কি ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়? তিনি যদি নিজ দেশের নিরীহ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, অথবা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের রক্ষা করছেন না, হয়তো বা অন্য কোনো দেশের চাপের কারণে, অথবা জেহাদি চাপে করতে পারছেন না, তাহলে সরকারে বসলেন কেন? জঙ্গিদের তিনি তো জেল থেকে একদিকে মুক্তি দিচ্ছেন আর অন্যদিকে হিন্দু সাধুদেরকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকাচ্ছেন। চিন্ময় প্রভুকে তো আটক করে জেলে ঢুকিয়েছেন, সঙ্গে আরও অনেক পুরোহিতকে আটক করে জেলে পুরেছে বা হুমকি দিচ্ছে। এমনও খবর পাওয়া যাচ্ছে যে পুরোহিতদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হচ্ছে প্রাণে বাঁচাতে বা জেলের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এসব কী হচ্ছে বাংলাদেশে? শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বহু হিন্দু চাকরীজীবিকে চাকরি থেকে জোর করে পদত্যাগ করানো হচ্ছে। অনেককে চাকরি ছাড়ার জন্য হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

যদি মানবাধিকার সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধি করার কথা ওঠে, কিংবা মানবাধিকার সংগঠনগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার কথা ওঠে, তাহলে অবশ্যই তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র, দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে হবে।

যারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বর্তমানে চলমান ঘটনার সঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘুদের ঘটনাকে এক পাল্লায় দেখছেন, তাদের জানা উচিত, ভারতে সংখ্যালঘুরা উলটে সংখ্যাগুরু জনগণকে হুমকি দেয়, হুঁশিয়ারি দেয়। কোনো কোনো সংখ্যালঘু নেতা তো ভারতের সংখ্যাগুরু জনগণকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার কথা বলে। কোনো কোনো সংখ্যালঘু নেতা বলে থাকেন যে, ১৫ মিনিট যদি পুলিশ না থাকে, তা হলে নাকি এই ১৫ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত সংখ্যাগুরু জনগণকে (হিন্দুকে) খতম করে দেবেন। কোনো কোনো সংখ্যালঘু নেতারা ভারতের সংসদে পাশ করা আইনকে সরকার চালু করতে চাইলে দেশে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। রেল লাইন পুড়িয়ে দেয়, দেশের সম্পত্তি নষ্ট করে দেয়। কোনো কোনো সংখ্যালঘু নেতা ভগবান শ্রীরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শিবকে নিয়ে কটুকথা বলে, গালিগালাজ করে, অপমানজনক কথা বলে, এরকম ঘটনা কি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা করছে?

বাংলাদেশের হিন্দুদের এই পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানি আইএসআই-এর হাত রয়েছে এবং তারাই এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী বলে মনে করছেন বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। জেহাদি শক্তির হাত থেকে বংলাদেশের নিরীহ হিন্দুদেরকে রক্ষা করা বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থাগুলির দায়িত্ব। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে অবশ্যই বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে এসব অত্যাচারের সুষ্ঠু তদন্ত হয় এবং সুষ্ঠু বিচার বাংলাদেশের হিন্দুরা পায়। অদূর ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশের হিন্দুরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয়। তবেই তো মানবাধিকার সংস্থার মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সার্থকতা প্রতিফলিত হবে। □

পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন সেই মুঘল শাসনকালে শুরু চলছে আজও

সায়ন্তন বসু

বাংলাদেশ যা পূর্ববঙ্গ বলে পরিচিত, আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যদিও আজকে যা ঘটছে, তা প্রথমবার ঘটছে এমন নয়। এই ধরনের ঘটনা এর আগেও বহুবার ঘটেছে। যেহেতু পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই সংখ্যালঘু হিন্দুরা সেখানে যুগের পর যুগ নির্যাতনের শিকার।

এই হিন্দু নিধন ও অত্যাচার শুরু হয় সেন রাজবংশের পতনের পর থেকে অর্থাৎ বখ্‌তিয়ার খলজির আক্রমণের পরবর্তী সময় থেকেই। এই সময় থেকেই ব্যাপকহারে হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করা শুরু হয়। যদিও বৌদ্ধদের একটা বড়ো অংশ দ্রুত ইসলামে ধর্মান্তরিত হন বলে মনে করা হয়। মুসলমান শাসনের প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গ মুসলমান প্রাধান্য লাভ করে মুঘল আমলের সময় থেকেই। এই সময়ে শাসনতন্ত্রের প্রায় সব স্তরেই মুসলমানরা নিরঙ্কুশ ছিল। দিল্লির বাদশা তার সর্বোচ্চ অনুগতকে সুবে-বঙ্গের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। এই সময়েই মুসলমানদের প্রায় বিনা মূল্যে জায়গা-জমি দেওয়া হয়। এভাবে হিন্দুদের উজ্জীবিত করা হয় ইসলাম গ্রহণ করতে। বিবিধ কারণে এক বিশাল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুঘল আমলেই পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। হিন্দুদের উপর জুলুমবাজি এক ব্যাপক আকার ধারণ করে। অবশ্য এই মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি সুলতানি আমল থেকেই হয়েছে। রাজা গণেশের পুত্র যদু যখন ধর্ম পরিবর্তন করে জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ্ হলেন, তখন থেকেই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নবাবি আমলে এই প্রবণতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। বিশেষ করে ১৭৫৬ থেকে ১৭৬২ পর্যন্ত হিন্দুদের মুসলমান করার প্রচেষ্টা একটি ব্যাপক রূপ নেয়।

ব্রিটিশ আমলে, যখন প্রথম জনগণনা হয় তখন এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তার আগে এই সমস্যা সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত ছিলেন না। স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গে ১৯৪১ সালে যে জনগণনা হয়, তাতে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ৪২ শতাংশ। যশোর, খুলনা জেলা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমনকী ১৯০৫ সালে ঢাকা শহরে দুর্গাপূজার সংখ্যা কলকাতা শহরের থেকে বেশি ছিল।

এই জনসংখ্যার বিন্যাসকে মাথায় রেখে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গকে দুর্বল করতে ১৯০৫ সালে কার্জন বঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাব করেন এবং ওই বছরের অক্টোবরে ওই প্রস্তাব কার্যকরী হয়। আজকের বাংলাদেশ, সঙ্গে অসম নিয়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ গঠিত হয়। এই বিভাজন হয়েছিল একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশ তৈরি করতে। বঙ্গের মুসলমান সমাজ এই বিভাজনকে সমর্থন করেছিল এবং স্বাগত জানিয়েছিল।

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাজন বাঙ্গালির সামাজিক জীবনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এই সমাজে বহুকাল বিদ্যমান, হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্যের সমস্যা বহু পুরানো, কিন্তু ১৯০৫-এর বিভাজন এই বাস্তবতাকে প্রকাশ্য রূপ দিল। হিন্দু সমাজ এই বিভাজনকে মেনে নেয়নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু বাঙ্গালি পথে নেমেছিলেন এই বিভাজনের প্রতিবাদ জানাতে।

কার্জন এই বঙ্গবিভাজনকে settled fact বলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'I shall unsettle the settled fact'। এই বিভাজন হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। মুসলমান সমাজ রাস্তায় নেমেছিল এই বিভাজনকে সমর্থন করতে। সেই সময়ের দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভাজন বিরোধী একটি সভা কলকাতার বিডন স্কোয়ারে (বর্তমানে হেদুয়া) অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সভাশেষে সবাই যখন বাড়ি ফেরার জন্য ট্রাম ধরতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময় মুসলমান দুষ্কৃতীরা তাদের আক্রমণ করে, মহিলাদের সম্মানহানি ঘটায় এবং ব্যাপক পরিমাণে লুট ছিনতাই করে। স্থানীয় থানা আজকের বড়তলা থানা কোনো ব্যবস্থা নেয় না, এমনকী কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারকে পরপর অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

অন্য একটি ঘটনা; এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে ব্যাপকহারে রাখিবন্ধন উৎসব প্রচলন করেন। তাঁর এই অনুষ্ঠান সারা বঙ্গে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব, যাতে এই বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও সজীব করা যায়। এই সময় কবিগুরু লিখলেন 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান'। যখন আন্দোলন তুঙ্গে, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ চললেন সদলবলে কলকাতার নাখোদা মসজিদে সেখানকার ইমামকে রাখি পরাতে। ইমাম রাখি পরলেন, কিন্তু ভীষণ ক্ষুণ্ণ হলেন এই আচারে। ইমামকে জোর করে রাখি পরানো হয়েছে, এই অভিযোগে ব্যাপক গণ্ডগোল হলো। এর ফলে আবার বহু হিন্দু পূর্ববঙ্গে বাস্তুচ্যুত হলেন, কারণ ঘটনার ব্যাপকতা পূর্ববঙ্গে বেশি ছিল।

যে সমস্ত পূর্ববঙ্গের শিকড়যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বাংলাদেশি মুসলমানদের প্রশংসাসূচক কথা বলেন, তারাও ওই দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাঙ্গালি হিন্দুকে জাগরিত করে। তারা প্রথমবার সংগঠিত হয়। বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বঙ্গের নবজাগরণ যা এই আন্দোলনের ১৫০ বছর আগে থেকে সংগঠিত হচ্ছিল, সেই

নবজাগরণের এক বৃহৎ ভূমিকা এই আন্দোলনে ছিল। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রকৃত যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

যে নবজাগরণ আমরা অখণ্ড বঙ্গে প্রত্যক্ষ করি, তা কিন্তু শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজ এই নবজাগরণের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কারণ তারা তাদের মাদ্রাসা সংস্কৃতি এবং ফার্সি ভাষার উপর নির্ভরশীল ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় বঙ্গে প্রথম নবজাগরণ হয় হিন্দুদের মধ্যে। দ্বিতীয় নবজাগরণ শুরু হলো রাজা রামমোহন রায়, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাত দিয়ে যা ১০০ বছরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু, আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিদের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

এই নবজাগরণ শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল না, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে তা পূর্ববঙ্গে পৌঁছে যায়। তাই তো এক বিশাল সংখ্যক কবি, লেখক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষ তাদের কর্মজীবনও পূর্ববঙ্গে শুরু করেছেন অথবা অতিবাহিত করেছেন। বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক সংগঠন, অনুশীলন সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই একশো বছরে পূর্ববঙ্গে এক বিশাল সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে যশোরের মধুসূদন দত্ত, বরিশালের জীবনানন্দ দাশ, যশোরের প্রমথনাথ চৌধুরী, রাজশাহীর রজনীকান্ত সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই পূর্ববঙ্গেরই মানুষ ছিলেন বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, যিনি বঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। বিপ্লবীদের বড়ো অংশের জন্ম, বাসস্থান, কর্মক্ষেত্র পূর্ববঙ্গে। মাস্টারদা সূর্য সেন যেমন চট্টগ্রামকে বিখ্যাত করেছেন, তেমন চট্টগ্রামেরই কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ। অলিন্দ যুদ্ধের তিন নায়ক বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। তাদের বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। প্রফুল্ল চাকী, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলির জন্মস্থানও পূর্ববঙ্গে।

১৯৪১ সালে জনগণনায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু ছিল ৪২ শতাংশ। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা কমে হয় ৩৮ শতাংশ। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা কমে হয় ২৮ শতাংশ। আজ প্রায় ৭ শতাংশ। হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দু বিতাড়ন বাংলাদেশে একটি দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা পরম্পরা। আজ বাংলাদেশের মানুষ জানে না সেই সমস্ত মহাপুরুষদের নাম, যাঁরা একদিন তাদের ভূমিকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। আজ চট্টগ্রাম মনে রাখেনি তাদের মাস্টারদাকে। যে মাস্টারদাকে ইংরেজ সরকার ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর আগে অমানুষিক অত্যাচার করে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহটা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম মনে রাখেনি কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতাকে। গণেশ ঘোষ পরবর্তী সময়ে সাংসদ হয়েছেন ভারতের সংসদে। চট্টগ্রামে তার স্মতিচারণা করার কেউ নেই। বাংলাদেশের মানুষ অগ্নিযুগের সেই মহাবিপ্লবীদের মনে রাখেননি, কোথাও কোনো মহাপুরুষের এক মূর্তি থাকতে পারে, কিন্তু দেখা যাবে তা অবহেলায় ভগ্নপ্রায়। অনেকের নামে স্মৃতিরক্ষা সমিতি আছে, কিন্তু সেও নামেই।

বরিশাল শহরে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার নামাঙ্কিত হলটি আয়ুব খানের নামে করা হয়েছে পাকিস্তানের সময়ে, ১৯৭১-এর পরেও অশ্বিনীকুমারের নামে ওই হলটি আর করা হয়ে ওঠেনি। এই হলটি অশ্বিনী কুমার স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢাকা শহর ছিল বিপ্লবীদের পীঠস্থান। সেখানে আজ বিপ্লবীদের স্মৃতির কোনো চিহ্ন নেই। বরিশালের জীবনানন্দের 'রূপসী বাঙ্গলা' কাব্যকে নিয়ে কোনো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় না। ঢাকা নিবাসী অতুলপ্রসাদের গান সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ লাভ করলেও বাংলাদেশে তার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত গৌণ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম স্থপতি বুদ্ধদেব বসু, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁকে বাংলাদেশের এই প্রজন্ম জানে না। অবশ্য এই কথা অনস্বীকার্য যে এতদিন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটা অংশে রবীন্দ্রচর্চার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। যদিও বর্তমানে ওই দেশে রবীন্দ্র চিন্তা বিরোধী মনোভাব মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার ব্যাপ্তি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই বেশি ছিল।

অনেকের ধারণা বাংলাদেশ সৃষ্টি বাঙ্গালি জাতীয়তার স্বার্থে। যদিও এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শেখ মুজিবুর রহমান অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক হতে চেয়েছিলেন, তা না হতে পেরে পৃথক বাংলাদেশের পরিকল্পনা করেন। ছাত্রজীবনে মুজিবুর যখন কলকাতায় থাকতেন তখন তিনি সোহরাবর্দির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতার হিন্দু হত্যাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন, যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি লিখেছেন তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে।

বাঙ্গালি জাতীয়তা বাংলাদেশের সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থান করছে। ইসলামিক আধিপত্যবাদ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মৌলিক চিন্তা। যারা এপার বঙ্গ-ওপার বঙ্গ করেন, তারা বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চান না। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, বাংলাদেশি মুসলমানদের মূল মন্ত্র হলো হিন্দু বিরোধিতা, তার জন্য হিন্দুদের ওপর আক্রমণ সেখানকার বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাস। নোয়াখালির বীভৎসতার বর্ণনা হয়েছে, ভোলার বীভৎসতার বর্ণনা হয়নি, কিশোরগঞ্জের বীভৎসতা লোকমুখে প্রচলিত হয়েছে। চুকনগরের হিন্দুহত্যার কথা লোকে জানে না।

বাংলাদেশের হিন্দু বিরোধী মানসিকতা বহু পুরোনো। প্রায় পাঁচশো বছর আগে চন্দ্রদ্বীপের জমিদার কীর্তিনারায়ণ বসু একাধিক কারণে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। তখন থেকেই পূর্ববঙ্গে হিন্দু বিরোধী মানসিকতার জন্ম। যে সমস্ত পূর্ববঙ্গের শিকড়যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বাংলাদেশি মুসলমানদের প্রশংসাসূচক কথা বলেন, তারাও ওই দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ স্বর্গীয় উৎপল দত্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কবি শঙ্খ ঘোষের নাম করা যায়।

বাংলাদেশে যখনই কোনো ডামাডোল হয়, তার শিকার অবধারিতভাবে হয় সেখানকার হিন্দুরা। কারণ সেখানকার অঘোষিত নীতি হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ। এই বাস্তবতা হিন্দুদের এবং সরকারকে বুঝতে হবে। ওরা প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল, ৩ মাস যদি সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকে, বাংলাদেশ তার বাস্তবিক অবস্থা টের পেয়ে যাবে। ওপারের হিন্দুরা কিন্তু ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে নিরাপত্তার আশায়। আমরাও রয়েছি একই আশা নিয়ে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আমরা ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হোক আমরা কখনোই চাইব না। তাই বেলডাঙ্গা, দেগঙ্গা, গার্ডেনরীচ, ক্যানিং, বসিরহাট, কালিয়াচক, উলুবেড়িয়ার ঘটনা আমাদের চিন্তা বাড়ায়। □

কালাপাহাড়ের ইতিহাস হোক উন্মোচিত

উত্তম মণ্ডল

ইতিহাসের কালাপাহাড়কে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। আর সেই গল্পের ভেতরে পালটে গেছে তার আসল পরিচয়টাই। 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস'-এর লেখক দুর্গাচন্দ্র সান্যাল থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে— সবার বক্তব্য একটাই : কালাপাহাড় ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রকৃত নাম কারও মতে, কালাচাঁদ রায়, আবার কারও মতে তার নাম রাজীবলোচন রায়। গৌড়ের শাহজাদির প্রেমে পড়েন এবং সে প্রেম পেকে বিয়ের আসর পর্যন্ত পৌঁছায়। তারপর হিন্দু সমাজপতি ও সুলতান শ্বশুরের সাঁড়াশি চাপে শেষে ধর্ম বদলে মুসলমান হোন। এরপর সেই রাগে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দেশের একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে কুখ্যাত হোন।

এককথায় বলতে গেলে, হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের নায়ক হিসেবে যে নামটি ইতিহাসের পাতা থেকে প্রথম উঠে আসে, সে নামটি হলো 'কালাপাহাড়।' 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস'-এর লেখক দুর্গাচন্দ্র সান্যাল এই কালাপাহাড়কে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান বানিয়ে তার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন, দুর্গাচন্দ্র সান্যালের কালাপাহাড়ের এই বিবরণ সম্পূর্ণ অমূলক ও কাল্পনিক। দুর্গাচন্দ্রের কলম থেকেই কালাপাহাড়ের জীবনের কাল্পনিক বদল ঘটেছে বিভিন্ন উপন্যাস ও যাত্রাপালায়। যেমন, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে তাঁর কালাপাহাড়কে নিয়ে লেখা যাত্রাপালায় 'পাহাড়ের চোখে জল' ঝরিয়ে ছেড়েছেন। সবটার বিষয়বস্তু এক, কালাপাহাড় হিন্দু ছিলেন, মুসলমান শাসক কন্যা দুলারীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হোন। সমাজে ফিরতে না পেরে হয়ে ওঠেন হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসকারী। সব মিলে গড়ে ওঠে এক মিথ্যে মিথ।

কিন্তু ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এই পুরো বিষয়টিকেই অমূলক ও কাল্পনিক বলেছেন। আসলে কালাপাহাড়ের ডাক নাম ছিল 'রাজু'। এই নাম হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। আর এটিই যত গণ্ডগোলের কারণ। এই 'রাজু' নাম দেখেই যাচাই না করেই কালাপাহাড়কে হিন্দু থেকে মুসলমান বানিয়ে মন্দির ভাঙার গল্প সাজিয়েছেন বহু লেখক। দুর্গাচন্দ্র সান্যালরাই তাঁদের পথ প্রদর্শক। কিন্তু দুর্গাচন্দ্র সান্যালের এই দুর্গাচন্দ্রী ব্যাখ্যা ইতিহাস স্বীকার করে না।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার কালাপাহাড়ের আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন বহু আগেই তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ, ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১২৩ পাতায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার জানাচ্ছেন, সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় প্রথমে হিন্দু, পরে মুসলমান হোন বলে কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই।

এরপর ড. মজুমদার কালাপাহাড়ের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা', বদায়ুনির 'মন্ত-খব-উৎ-তওয়ারিখ' এবং নিয়মাতুল্লাহর 'মখজান-ই-আফগানি' থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায়, কালাপাহাড় জন্মসূত্রেই আফগান মুসলমান ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য তথ্য হলো, কালাপাহাড় ছিলেন সুরি বংশের বিখ্যাত শাসক শেরশাহের বংশোদ্ভূত। এই সুরি বংশের শাসক সিকান্দার সুরির ভাই ছিলেন 'রাজু' ওরফে কালাপাহাড়। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শের খান দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তখন তাঁর নাম হয়— ফরিদউদ্দিন আবুল মুজফ্ফর শেরশাহ, সংক্ষেপে শেরশাহ। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল শাহ সিংহাসনে বসেন, 'ইসলাম শাহ' নাম নিয়ে। এই ইসলাম শাহের আমলেই কালাপাহাড়ের আক্রমণ হয় কামরূপে এবং ধ্বংস হয় কামাখ্যার মন্দিরগুলি।

ইসলাম শাহ থেকে শুরু করে দাউদ কররানির রাজত্বকাল পর্যন্ত কালাপাহাড়কে বাঙ্গলার সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসেবেই দেখা যায়। এই দাউদ কররানির মৃত্যুর ৭ বছর পর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। সে মৃত্যুও হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রেই। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সে দলেরই মাসুম কাবুলি। কালাপাহাড় সে সময় মাসুম কাবুলির সঙ্গে যোগ দেয় এবং মুঘলদের গুলিতেই তার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা আসে মুঘল বাদশা আকবরের হাতে। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এ কালাপাহাড়কে বাবরের বিশিষ্ট আমির এবং আকবরের সেনাপতি হিসেবে ওড়িশা জয়ের কথা বলা হয়েছে। এটিও অমূলক।

১৫৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে শীতকালে আকবর যখন চিতোর দখলে ব্যস্ত, সেই সুযোগে বাঙ্গলার শাসক সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় একদল দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ওড়িশার জাজপুর অঞ্চল থেকে পুরী দখল করে সেখানকার জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরের ধন-সম্পত্তি লুঠ করে, আংশিকভাবে মন্দিরটি ভেঙে ফেলে। তারপর বহু সোনার মূর্তিসহ অনেক মণ সোনা হাতিয়ে নেয়। এছাড়াও, কোনারকের সূর্যমন্দিরও আক্রমণ করে কালাপাহাড় এবং সেই আক্রমণে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রথম ওড়িশা চলে গেল মুসলমান দখলে।

মন্দির ধ্বংসের খলনায়ক সুলেমান কররানির সেনাপতি এই 'রাজু' ওরফে কালাপাহাড় ছাড়াও দ্বিতীয় আরেকজন কালাপাহাড়ের খোঁজ পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় কালাপাহাড় ছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক বহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রি.) এবং তাঁর পুত্র সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.)-র সমসাময়িক এই দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাঁদের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তবে এই দু'জনের নাম কেন 'কালাপাহাড়', সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। গল্পের বাইরে এই হলো আসল কালাপাহাড়, ইতিহাসের কালাপাহাড়। □

অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগঠিত হতে হয়

ভাস্কর ভট্টাচার্য

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এখন থেকে ভাবতে হবে, যে পশ্চিমবঙ্গকে এক সময় হিন্দুদের বসবাস করার জন্য পাকিস্তানের কবল থেকে কেড়ে এনেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই বাসভূমি আজ কতটা সুরক্ষিত? বর্তমানে 'ইসলামিক বাংলাস্তান' করার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। এটা শুধু বাংলাদেশের জেহাদি নাগরিকরা চাইছে না। চাইছে জামাত ইসলাম-সহ বেশ কিছু কট্টরপন্থী নিষিদ্ধ দল। আসলে এদের দর্শন হচ্ছে অন্য দর্শনকে ছোটো করা, নিজের দর্শনকে বড়ো করে দেখানো। অন্য দর্শনকে ঘৃণা করতে শেখানো। কিন্তু সনাতন ধর্ম সেটা বলে না। সে বসুধৈব কুটুম্বকমের কথা বলে। সে শুধু মানুষ নয় গোটা বিশ্ব, প্রকৃতি, পশু, নদী, গাছ সকলকে রক্ষা করার কথা বলে।

দু'দিন আগেই কি কেউ ভেবেছিল বাংলাদেশের হিন্দু মা বোনেরা যাদের ওপর রক্ষার দায়িত্ব ছিল তারাই তাদের নিধন করতে দ্বিধা করছে না। অপরদিকে সেই চুক্তি কিন্তু ভারত মেনে চলছে বলেই আজ ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে।

হিন্দুরা সকলকে নিয়ে চলতে পারে। হিন্দুরা সকল ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে নিজেদের আত্মরক্ষার, মৌলিক অধিকার রক্ষার এবং সর্বপরি নিজেদের বাসভূমি রক্ষার ভাবনাকেও যুক্ত করতে হবে প্রতিটি হিন্দু ভাই, বোন, মায়েদের। না হলে কোনো দিন নিজেদের ওপর অত্যাচার নেমে এলে, রক্ষা করার সময় পাওয়া যাবে না।

হিন্দুরা কাউকে ধর্মীয় কারণে বা অন্য কোনো কারণে অত্যাচার করে না। কারোর জমি ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবে না। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত হওয়া বা আঘাত করায় কোনো অন্যায় নেই। এটা ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ভারতবর্ষে।

ভারত অগ্নি মিসাইল তৈরি করেছে অন্যকে ধ্বংস করার জন্য নয়। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না যে হিন্দুরা কখনো হিংসার আশ্রয় নিয়ে কারোর ওপর অত্যাচার করেছে বা জোর করে কারোর জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই আজ পুরো হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে জাতিগত বিভেদ ভুলে। আগে আমরা হিন্দু। পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নমশূদ্র ইত্যাদি।

কংগ্রেসের আমলে ধারা ২৮-এর কোনো বিরোধিতা হয়নি যা ভারতীয় সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে। সরকার পরিচালিত কোনো বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না, যেহেতু ভারত সেকুলার দেশ। সারা দেশে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা চলছে সরকারি টাকায়। সেখানে মজহবি শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ হিন্দুদের গীতা, রামায়ণ, বেদ পড়াবার অনুমতি নেই। পড়ানোর চেষ্টা হলেই এই সেকুলার জীবেরা চিৎকার শুরু করে দেয়।

সেকুলারিজম শব্দটি কেন সংবিধানে থাকবে? কেন তার বেআইনি অন্তর্ভুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যা জরুরি অবস্থার সুযোগে কোনো বিতর্ক ছাড়া, বিরোধী নেতাদের জেলে পুরে সংসদে পাশ করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সংখ্যালঘু কমিশন আইন চালু করে, অথচ সংবিধানে সংখ্যালঘুর কোনো সংজ্ঞা নেই। এটা কি দ্বিচারিতা নয়? এই ভাবে বাংলাদেশি মুসলমানদের ভারতে ঢুকিয়ে, ভুয়ো পরিচয়পত্র দিয়ে ভোটার বানানো শুরু হয়। যা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে বামেরা আর পরে এই মমতার সরকার আরও বেশি করে এই ব্যবস্থাকে নির্ভর করে ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসেছে। আর হিন্দুরা ক্রমশ তাদের অধিকার, জমি, সবকিছু হারাচ্ছে।

> "সরকার পরিচালিত কোনো বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না, যেহেতু ভারত সেকুলার দেশ। সারা দেশে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা চলছে সরকারি টাকায়। সেখানে মজহবি শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ হিন্দুদের গীতা, রামায়ণ, বেদ পড়াবার অনুমতি নেই।"

কী হবে বা না হবে, তার ওপর ভরসা আর করা যায় না। জেহাদিদের আক্রমণ এত সহজে ১৯৪৬ সালের মতে হিন্দুরা মেনে নেবে না। তাদের রক্তেও শ্যামাপ্রসাদের, বাঘা যতীনের, বিনয়, বাদল, দীনেশ, সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরামের রক্ত বইছে। মা-বোনদের মধ্যে মাতঙ্গিনীর রক্ত, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের রক্ত বইছে। এবার সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। দেরি করলে ওই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো পরিণতি হবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের।

ভুলে গেলে চলবে না, যারা আজ ঐশ্বর্যের শয্যায়, আরামের জীবন যাপন করছেন, এক মুহূর্তে সব শ্মশানে পরিণত হতে পারে। আমাদের ধৈর্য, সহনশীলতা, মুখ ঘুরিয়ে থাকা আর ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ আজ খুলতে হবে। কারণ শত্রুরা এগুলোকে আমাদের দুর্বলতা ভাবে, আর তার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমানদের হারও ছিল ৮০:২০, ২০২৩-এ সেটা ৭৩:২৭ (২০১১-র সেনসাস অনুযায়ী) খাতায় কলমে। বাস্তবে ৬০:৪০। ২০২৫-এ জনগণনা হলে আসল তথ্য সামনে আসবে। আজ বাংলাদেশকে দেখে শিক্ষা নিতে হবে। হিন্দুরা জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কি সময় আসেনি?

কারোর ওপর আক্রমণ হলে যাতে সমগ্র হিন্দুজাতি জেগে ওঠে এবং প্রত্যাঘাত করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা সময়ের চাহিদা। হিন্দুদের অস্ত্র হলো ভোট। তার মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনই একমাত্র পথ। □

অঙ্গদানের গুরুত্ব অপরিসীম

কোনো জীবিত ব্যক্তি দীর্ঘস্থায়ী রোগে যাঁর কোনো একটি অঙ্গ বিকল হয়ে গেছে, তাঁর অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির থেকে জৈবিক টিস্যু বা কোনও একটি অঙ্গ নিয়ে তাঁর প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া হলো অঙ্গদান।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রক্তদানের মতোই অঙ্গদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই, ভারতের মতো দেশে প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গের যা চাহিদা— জোগান তার চেয়ে অনেক কম। এর প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। অঙ্গদান নিয়ে মানুষের মনে ভয় ও ভ্রান্তধারণা রয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথম গ্রিন করিডর ব্যবহার করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। উত্তর ২৪ পরগনার স্কুলছাত্র স্বর্ণেন্দু রায় এক দুর্ঘটনায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চিকিৎসকরা 'ব্রেন ডেথ' ঘোষণার পর পরিবার অঙ্গদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সন্তানের কিডনি, চোখ ও লিভার দান করতে সম্মত হন বাবা-মা।

অগুনতি মানুষের জীবনরক্ষায়, তাঁদের আবার নতুন করে বেঁচে থাকার রসদ জোগায় অঙ্গদান। এর চেয়ে পবিত্র ও মহৎ কাজ আর নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে অঙ্গদানের হার সবচেয়ে কম। এখানে প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গের চাহিদা জোগানের তুলনায় অনেক বেশি। তাই অঙ্গদানের গুরুত্ব, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতি বছর ১৩ আগস্ট পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব অঙ্গদান দিবস।

পরিসংখ্যান বলছে, ১৪০ কোটির দেশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রতিদিন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষায় দিন গুনছেন। যার মধ্যে এক শতাংশ মাত্র তাঁদের প্রয়োজনের অঙ্গটি পেয়েছেন। কাজেই সবার লক্ষ্য হোক মানুষকে অঙ্গদান সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহিত করা।

প্রথম অঙ্গদান : রোনাল্ড লি হেরিক প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর অঙ্গদান করেছিলেন। তিনি তাঁর যমজ ভাই রিচার্ডকে কিডনি দান করেছিলেন। চিকিৎসক জোসেফ মারে সফল কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন

করেছিলেন। ১৯৯০ সালে সার্জন জোসেফ মারে এবং নেফ্রোলজিস্ট জন মেরিল অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পান। প্রথমে ভারতে অঙ্গদান দিবসটি পালিত হতো প্রতিবছর ২৭ নভেম্বর। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ভারতে প্রথম মৃত দাতার সফল হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট দিনটিকে স্মরণ রেখে ২০২৩ সালে ১৩ আগস্ট নতুন করে অঙ্গদান দিবস পালন শুরু হয়।

অঙ্গদান কী : কোনো রোগীর অঙ্গ বিকল হয়ে গেলে তখন তাঁকে অঙ্গদানের প্রয়োজন হয়। কিডনি, হার্ট, অগ্ন্যাশয়, চোখ ও ফুসফুসের মতো অঙ্গদান দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। কোনো জীবিত ব্যক্তি দীর্ঘস্থায়ী রোগে যাঁর কোনো একটি অঙ্গ বিকল হয়ে গেছে, তাঁর অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির থেকে জৈবিক টিস্যু বা কোনও একটি অঙ্গ নিয়ে তাঁর প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া হলো অঙ্গদান।

অঙ্গদানের প্রক্রিয়া : অঙ্গদান দু'ভাবে হতে পারে।

● জীবিত অবস্থায় অঙ্গদান এবং মৃত অবস্থায় অঙ্গদান।

● জীবিত দাতা অঙ্গদানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর একটি কিডনি, একটি ফুসফুস, যকৃতের একটি অংশ, অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ এবং অন্ত্রের একটি অংশ দান করতে পারেন।

● অন্যদিকে মৃত দাতা দুটি কিডনি, যকৃৎ, ফুসফুস, কর্নিয়া, হৃৎপিণ্ড, অগ্নাশয়, অন্ত্র-সহ বিভিন্ন টিস্যু, হাত, মুখ— সব দান করতে পারেন।

● যেসব অঙ্গদাতা জীবিত অবস্থায় অঙ্গদান করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অঙ্গদানের পরে কোনো নির্ভরতা ছাড়াই সুস্থ জীবনে ফিরেছেন। কারণ জীবিত ব্যক্তিদের অঙ্গদানের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির সুস্থতাকে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়।

● মৃত ব্যক্তির অঙ্গদানের ক্ষেত্রে যিনি দাতা তাঁকে হাসপাতালে, ভেন্টিলেটরে রাখা হয় এবং ব্যক্তি যে মৃত তা চিকিৎসক নিশ্চিত করেন তারপরেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়।

● এই অবস্থায় ভেন্টিলেটরে থাকার সম্পূর্ণ খরচ বহন করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল।

● এছাড়াও কোনো ব্যক্তির ব্রেন ডেথ হলে, সেক্ষেত্রেও সেই ব্যক্তির পূর্বসম্মতিতে অঙ্গদান করা সম্ভব। অর্থাৎ যদি তিনি আগে বলে গিয়ে থাকেন তবে পরবর্তীতে তাঁর নিকটাত্মীয় সেই অঙ্গ দান করতে পারে। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত পরিবার নিতে পারে।

● চোখে গুরুতর কোনো সংক্রমণ না থাকলে যে কোনো ব্যক্তিই তাঁর কর্নিয়া দান করতে পারেন।

● ১৮ বছরের কমবয়সি ব্যক্তি অঙ্গদান করতে চাইলে তাঁকে বাবা-মা অথবা অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে।

● চাইলেই মরণোত্তর অঙ্গদান সহজে করা সম্ভব নয়, তার কারণ মৃত ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তাঁর অঙ্গটি কাজে লাগবে কিনা।

● অঙ্গদানের অঙ্গীকার করার জন্য কোনও মেডিক্যাল টেস্টের প্রয়োজন হয় না।

● ভারতের অঙ্গদান নিয়ন্ত্রণ করার আইন রয়েছে। অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইন মেনেই হয়। আইন একমাত্র জীবিত ও মৃত ব্যক্তিকে অঙ্গদানের অনুমতি দিতে পারে।

সবাইকে অঙ্গদানে উৎসাহিত করতে হবে—

● অঙ্গদান নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সে সম্পর্কে মানুষকে করা এবং সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া সবচেয়ে জরুরি এই মুহূর্তে। অনেকেই একে ধর্মবিরুদ্ধ মনে করেন যেটা একেবারেই ভ্রান্ত। অঙ্গদানের মতো পবিত্র কর্তব্য আর নেই।

● অঙ্গদান করলে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একজন জীবিত অঙ্গদাতা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিয়ম মেনে অঙ্গদান করে সারাজীবন সুস্থ থাকতে পারে। এমনকী মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও শরীর থেকে অঙ্গ বার করে নেওয়ার পরে আবার সেই দেহ শেষকৃত্যের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয় পরিবারকে।

● অনেকেই মনে করেন বেশি বয়সে অঙ্গদান করা যায় না। আসলে কিন্তু বয়স কোনও ভাবেই অঙ্গদানের ক্ষেত্রে বাধা নয়।

● একটি সমীক্ষা অনুযায়ী পরিবারের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলে অনেক ভুল ভেঙে যায়, অনেক কঠিন সময়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হয়ে ওঠে। পরিবারে, স্কুল, কলেজে যদি আলোচনা করা হয় অঙ্গদান নিয়ে, তবে দিনে দিনে অঙ্গদানের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

● রোজই বেড়ে চলেছে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এবং ক্রনিক কিডনির রোগ সবই এখন লাইফস্টাইল ডিজিজ। যার কোনো ওষুধ হয় না। ফলে সময়ের আগেই অঙ্গ বিকলতার দিকে এগোচ্ছে মানুষ।

যার ফলে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে অঙ্গের চাহিদা, বিশেষত কিডনি ও লিভারের। চাহিদা ছাড়াচ্ছে জোগানকে। ফলে বহু রোগী উপযুক্ত দাতার অভাবেই মারা যান, তাই কেবলমাত্র সময়মতো অঙ্গদানই বাঁচাতে পারে এইসব রোগীর জীবন। □

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান সমারোহ

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতাব্দী সভাগৃহে ৩৫তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান সমারোহের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কেরালার রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মোহাম্মদ খান। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রবীণ আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন কুমার তুলস্যান এবং পাঞ্চজন্য পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর। প্রধান বক্তারূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। এবারের সম্মান প্রদান করা হয় সুপ্রসিদ্ধ লেখক, চলচ্চিত্র নির্দেশক ও অভিনেতা ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র 'পূর্ণ করেঙ্গে হম সব কেশব' সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ। এরপর মঞ্চস্থ অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন ডঃ অজয় প্রতাপ সিংহ, প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, সত্যপ্রকাশ রায়, মনীষ জৈন এবং মনোজ কাকড়া। চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীকে পুস্তকালয়ের উপাধ্যক্ষ ভগীরথ চাণ্ডক মালা পরিয়ে, হিতেশ শঙ্কর শ্রীফল দিয়ে, সজ্জন তুলস্যান শাল পরিয়ে এবং সুনীল আম্বেকর ও রাজ্যপাল মহোদয় আরিফ মোহাম্মদ খান মানপত্র ও এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে সম্মানিত করেন। সম্মানে ভূষিত হয়ে ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছি কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো। এই সম্মান সেই বিচারধারা ও পথের প্রতি সম্মান, যা সম্বল করে আমি জীবন শুরু করেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি অতি প্রাচীন কিন্তু চিরনবীন। আমার খুব ভালো লাগছে যে নবীন প্রজন্ম এই বিষয়টি বুঝতে পারছে।' সুনীল আম্বেকর বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ার রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত মানুয়ের প্রয়োজন অনুভব করেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপনা করেন। যখন যখন হিন্দু সমাজ রাষ্ট্রীয়তার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তখনই দেশ ও সমাজের ওপর বিপদ নেমে এসেছে। তিনি বলেন, এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু এখানকার হিন্দু সমাজ একজোট হয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করছে, এ থেকে সবাইকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। সভাপতির ভাষণে রাজ্যপাল মহোদয় বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান প্রাপ্ত করা, আর একাজ নিরন্তর করে যেতে হবে। ভগবদ্গীতা শুধু পড়ার জন্য নয়, তার বাণী হৃদয়ঙ্গম করে নিজেকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গর্ব করার মতো। ডাঃ হেডগেওয়ারের উদ্দেশ্য ছিল জনমানসে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করে জাতীয় জাগরণকে ত্বরান্বিত করা।'

অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন ডঃ তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের সচিব বংশীধর শর্মা। অনুষ্ঠান সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন সঞ্জয় মণ্ডল, ভগীরথ সারস্বত, শ্রীমোহন তিওয়ারী, গায়ত্রী বজাজ, অরুণ সিংহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার রানি রাসমণি রোডে বাঙ্গালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতি এবং বঙ্গ বিবেকের যৌথ উদ্যোগে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি রোডে 'বাঙ্গালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতি' এবং 'বঙ্গ-বিবেক'-সহ একাধিক জাতীয়তাবাদী, সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জয়ের (১৯৭১) স্মরণে 'বিজয় দিবস' পালিত হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অরাজকতা তথা ধারাবাহিকভাবে সেদেশে হিন্দু নির্যাতন, উৎপীড়ন, খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে 'আর নয় পলায়ন, এবার পরাক্রম'— এই সংকল্প গ্রহণ করে সভায় অত্যাচারী জেহাদিদের প্রতি বার্তা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে আয়োজিত এই ধিক্কার সভায় অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠপাট বন্ধ, হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুক্তি এবং বাংলাদেশে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হন বক্তারা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজিপি, আইপিএস বি এন রমেশ, নবীন সন্ন্যাসী সঞ্জয় শাস্ত্রী, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সৈনিক ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই, জাতীয়তাবাদী সংগঠনের কার্যকর্ত্রী শ্রাবণী মান্ডি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ। বক্তারা একাত্তরের বিজয় দিবস স্মরণ করে বাংলাদেশের ধারাবাহিক হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তথা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য হিন্দু জনমানসে বার্তা দেন। একইভাবে অত্যাচারী জঙ্গি-জেহাদিদের হুঁশিয়ারিও দেন। উল্লেখ্য, এই প্রথম প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে বাংলাদেশে ধারাবাহিক হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে হুঁশিয়ারি দেওয়ার মতো কোনো সভা সম্পন্ন হলো।

এদিন বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে প্রথম বক্তা ড. জিষ্ণু বসু বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি খানসেনাদের বিরুদ্ধে বঙ্গ জিতেছিল, ভারত জিতেছিল। খানসেনারা বেছে বেছে হিন্দু নিধন চালিয়েছিল, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুরা পুনরায় গণহত্যার শিকার। এর থেকে বোঝা যায় যে এই অত্যাচার-নির্যাতনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। এবার থেকে আর কোনো অত্যাচার সহ্য করা নয়, আমাদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এই অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে।

ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই বলেন, এই লড়াই ন্যায়ের জন্য। তাই হিন্দুদের সংগঠিতভাবে এই জেহাদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারত জয়ী হয়। ভারতীয় সেনার হাতে বন্দি হয় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা। ১৯৭১-এর বিজয় হতে প্রেরণা নিয়ে জেহাদিদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

নবীন সন্ন্যাসী তথা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি সঞ্জয় শাস্ত্রী বলেন,পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা সর্বস্ব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন

১০০ দিনের কাজের জন্য নয়, ভাতা নিতেও নয়। ধর্ম রক্ষার্থে, মা-বোনেদের সম্মান বাঁচাতে। তাই ধর্ম রক্ষার জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, জঙ্গি-জেহাদিদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়তে হবে। আইপিএস বি এন রমেশ বলেন, সেদিনের বিজয় ছিল ভারতের সর্বস্পর্শী বিজয়। সেই বিজয় দিবসের সংকল্প নিয়ে সর্বাত্মকভাবে অত্যাচরিত মানুষের রক্ষায় সকল রাষ্ট্রবাদী শক্তির যোগদান আবশ্যক।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক অধিকারী বলেন, আমি বাঙ্গালি হিন্দু নই, আমি হিন্দু বাঙ্গালি। হিন্দু পরিচয় নিয়ে কোনোরকম দ্বিধা- সংশয় রাখলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী ভারতের সংবিধানের শপথ নিয়ে হিন্দুদের ক্রমাগত হুমকি দিয়ে চলেছেন। তাকে মুখ্যমন্ত্রী এখনও মন্ত্রীসভায় বহাল রেখেছেন। ভারতের স্বার্থে, ধর্মের স্বার্থে মা কালী খড়্গ হাতে নামবেন, মা দুর্গা ত্রিশূল হাতে নামবেন। জঙ্গি-জেহাদিদের ধারাবাহিক আক্রমণ প্রতিরোধে হিন্দুদেরও এবার সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে।

অনিবার্য কারণবশত সভার মুখ্য অতিথি জগদ্গুরু স্বামী রামভদ্রাচার্যজী মহারাজ সভায় আসতে না পারলেও তাঁর ভাষণের রেকর্ডিং সভায় শোনানো হয়। মহারাজ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান। জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে আপামর হিন্দুসমাজকে সংগঠিত হওয়ার এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ হিন্দুসমাজ লাভ করবে এবং সব লড়াইতে জয়যুক্ত হবে বলেও তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

সভার প্রধান বক্তা স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মন্ত্রে। ইনকিলাব জিন্দাবাদে নয়। বাঙ্গালি হিন্দুকে মূর্খতা ত্যাগ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো ধর্মরাজ্য স্থাপনে ব্রতী হতে হবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যের মতো চাঁদ কাজি দমনে উদ্যত হতে হবে। 'টলারেন্স' অনেক হয়েছে, এবার স্বামীজীর বাণী অনুসরণের সময়। 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ'— কবি নজরুলের লেখা গানটির উল্লেখ করে গীতার মন্ত্রে হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভার সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ। এই সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী, পূর্ত দপ্তর এবং সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ-সহ সমস্ত রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, জনসংখ্যা তখনই হ্রাস পায় যখন সেই ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন চলে। এছাড়াও দলিত-মুসলমান ঐক্যের মতো ভয়াবহ ন্যারেটিভের বিরুদ্ধেও সকলকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান ড. ঘোষ।

শৌর্য দিবস উপলক্ষ্যে বজরঙ্গ দলের পথ সঞ্চলন

গত ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত এবং বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন থেকে শ্যামবাজার ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ-স্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয় পর্যন্ত আয়োজিত হয় শৌর্য পথ সঞ্চলন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার হাতে পরাজয় স্বীকার করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যার বুকে সৃষ্টি হয় কলঙ্কচিহ্ন গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইতিহাস। কলঙ্কচিহ্ন ভেঙে যে শৌর্য ও পরাক্রম প্রদর্শন করেছিল বজরঙ্গ দল ও করসেবকরা, হিন্দুসমাজের সেই শৌর্য স্মরণে এদিন হয় শৌর্য পথ সঞ্চলন। বজরঙ্গ দলের গণবেশে পথ সঞ্চলন শুরু হওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস এবং বজরঙ্গ দলের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অমল চক্রবর্তী। পথ সঞ্চলনের নেতৃত্ব দেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মানিকচন্দ্র পাল এবং বজরঙ্গ দলের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক শঙ্কর বসু। পথ সঞ্চলন শেষে বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক এবং অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখ স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়।

সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে

গীতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের এক মহান উক্তি রয়েছে, ''উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে''। সত্যিই তাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতবাণী বা সংগীতে লক্ষ কণ্ঠে মুখরিত হলো শিলিগুড়ির আকাশ বাতাস। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) শিলিগুড়ির অদূরে কাওয়াখালি ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। আয়োজকরা ময়দানের নামকরণ করেছেন 'কুরুক্ষেত্র ময়দান'। সত্যিই যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দান। তবে এই যুদ্ধ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার নয়, হিন্দু ধর্মের অন্যতম কৃষ্টি, শক্তি, জীবনের পথনির্দেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য শ্রীশ্রীগীতার মাধ্যমে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার যুদ্ধ।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এই অনুষ্ঠানটিকে উৎসর্গ করেছেন বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের। তবে তারা আশঙ্কিত ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সে দেশের হিন্দুরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন কিনা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে এই কারণে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রককে অনুরোধ জানানো হয়, যাতে বাংলাদেশের হিন্দু ভাই-বোনেরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করার।

সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি পদ অলংকৃত করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙার সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও সংসদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন রিষড়া প্রেম মন্দিরের স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ধর্মাত্মানন্দজী মহারাজ, কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের স্বামী ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ এবং লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ আয়োজক সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল।

স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ বলেন, কিছুদিন আগে কুরুক্ষেত্র থেকে মাটি এনে মাটি এনে কাওয়াখালী মাঠে স্থাপন করা হয়েছে। তাই এর নাম কুরুক্ষেত্র ময়দান। এখন এটি কুরুক্ষেত্র সনাতন সংস্কৃতির প্রসারের সাক্ষী হতে যাওয়া এক ক্ষেত্র। গীতার মাহাত্ম্য প্রসারের এক ক্ষেত্র। অনুষ্ঠানের শালীনতা ও ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে মা-বোনেদের জন্য লাল পাড় সাদা শাড়ি এবং পুরুষদের সাদা কুর্তা পাজামা বা ধুতি পরে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে গীতার প্রথম, দ্বিতীয়, দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ— এই পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করা হয়। আয়োজকরা অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা করেছিলেন। পুলিশের পাশাপাশি প্রায় দু' হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত হয়েছিল। দমকলের ইঞ্জিন, ড্রোন, সিসিটিভি সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মেডিক্যাল ক্যাম্প, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সহায়ক দল উপস্থিত ছিল। গীতার মাহাত্ম্যের টানে বাংলাদেশ ইসকনের বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী গেরুয়া বস্ত্র লুকিয়ে প্যান্ট পরে ময়দানে উপস্থিত হন। গীতাপাঠের মঞ্চ থেকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষার কথা। এই মহতী কর্মযজ্ঞকে সফল করতে কার্যকর্তারা বিগত ১৫ দিন যাবৎ রাতদিন এক করে পরিশ্রম করেছেন। দূরবর্তী জেলা থেকে আসা লোকেদের ওই ময়দানের একপাশে অস্থায়ী শিবির করে স্নান, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সন্ত সমাজকে বিভিন্ন মঠ-মন্দির ও সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন সবার জন্য নিঃশুল্ক জলযোগ, দুধ, চা,

শিলিগুড়িতে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ

জল এবং অনুষ্ঠান শেষে সুষ্ঠুভাবে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বয়স্ক পুণ্যার্থী ও সন্তদের উৎসবস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবক হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহুজনই বাড়িতে গীতা পাঠ করে থাকেন তবে, সন্ত সমারোহে একসঙ্গে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে এক পরম পুণ্য অর্জন, এক পরম সুখানুভূতি, এক ঐশ্বরিক উপলব্ধি। অনুষ্ঠানে নজর কাড়ে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি। শঙ্খ হাতে মায়েরা এই পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করেন। তাদের মতে, জীবনে এমন পুণ্যের সুযোগ বারবার আসে না। এই ঐশ্বরিক মুহূর্তকে তাই অন্তর থেকে উপলব্ধি করছি। গীতার স্থান সমস্ত হিন্দুর অন্তরে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তো হিন্দুসমাজের সর্বকালের পাথেয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সূত্র ধরেই স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ থেকে লক্ষ্মণ বনসল সকলের মুখেই ছিল একই কথা— হিন্দুরা শান্তি ও সহাবস্থান চায়। তবে ধর্ম ও কর্ম রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়।

অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রত্যেক কার্যকর্তা থেকে সকল পুণ্যার্থীর নাম নথিভুক্ত করে পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে ময়দানে প্রবেশ করতে হয়।

এই সমারোহে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পূজ্য গীতা মনীষী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ এবং অন্যান্য অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্ত, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল ভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের পুস্তক বিপণী। যেখানে কয়েক হাজার গীতা একদিনে বিক্রি হয়ে যায়। ধর্মীয় বহু পুস্তকেরও ব্যাপক প্রচার ও বিক্রি হয়।

বিদ্যা ভারতী ও সংস্কার ভারতী দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওইদিন সকাল থেকেই মূল মঞ্চে পরিবেশিত হয়। এছাড়া ভক্তিমূলক গান, শ্লোক পাঠ, মন্ত্রোচ্চারণে সম্পূর্ণ ময়দান ভক্তিক্ষেত্রে পরিণত হয়। বেলা বারোটা তিন মিনিটে পুণ্যলগ্ন অনুসারে মূল মঞ্চ থেকে সন্তদের দ্বারা গীতা পাঠে লক্ষাধিক মানুষ একসঙ্গে এক সুরে গীতার পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করেন। এমনিতেই শিলিগুড়ি শহর পাহাড়, জঙ্গল ও সমভূমির মিলনক্ষেত্র। রামনবমী, দুর্গাপূজা, গণেশ চতুর্থী, জগদ্ধাত্রী পূজা, ছটপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়। এবারে গীতা পাঠের মহাযজ্ঞে এই ভূমির পবিত্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। গীতাপাঠ শেষে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীর হিন্দু সমাজের প্রতি আবেগঘন ভাষণ সকলকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি বলেন, এই বঙ্গভূমি শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখের জন্ম ও কর্মভূমি। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা আজ সংকটে পূর্ণ। পশ্চিমি ভোগবাদ ও ইসলামি মোল্লাবাদ আজ যেন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চায়। তাই প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য, সংস্কৃতির চর্চা, সুশিক্ষা প্রাপ্তি। এই সবের আধার গীতাকে অন্তরে স্থান দেওয়া। মন ও প্রাণের ভালো থাকার রসদ হলো ঐশ্বরিক শক্তি, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা। প্রকৃতির শক্তি ও ঐশ্বরিক শক্তির মিলন ঘটাতে পারলে আমরাও মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারি। যার একমাত্র মাধ্যম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তাই পঞ্চম বেদ গীতার স্মরণ, শ্রবণ ও পাঠের মধ্যে দিয়ে শিলিগুড়ির কাওয়াখালী কুরুক্ষেত্র ময়দান ইতিহাসের সাক্ষী থাকলো। রচিত হলো হিন্দু ঐক্য, সংহতি এবং এক ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ডের পথ চলার। সাফল্যমণ্ডিত হলো এক মহান কর্মযজ্ঞ।

ফঃ ৪

ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

গত ১১ ডিসেম্বর, বহরমপুর শহরে ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংস্থার কার্যকর্তা, সদস্য-সহ শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও উপস্থিত হন। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কয়েকটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পাঠরত চিকিৎসক এবং ছত্রপতি শিবাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের সদস্যরাও সম্মেলনে উপস্থিত হন। অতিথিরূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য পঙ্কজ মণ্ডল, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার প্রমুখ মন্দার গোস্বামী এবং বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডল।

শহরের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার সাহা প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন এন এম ও-এর জেলা সভাপতি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদক ডাঃ মৃন্ময় অধিকারী। উপস্থিত কার্যকর্তারা সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সেবামূলক কাজে অধিকাধিক অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেন। শান্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত সকলে নৈশভোজে অংশ নেন।

উত্তরবঙ্গ ইতিহাস সংকলন সমিতির উদ্যোগে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন কর্মসূচি

গত ২৭ অক্টোবর কোচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত হলো ইতিহাস সংকলন সমিতি উত্তরবঙ্গ প্রান্তের একদিবসীয় কর্মসূচি। এদিন কোচবিহারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোচবিহারের কামতেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিতদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে কর্মসূচির শুভারম্ভ হয়।

কামতেশ্বরী মন্দির এবং দিনহাটার গোসানিমারী রাজপাট ঢিবি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ রায়গঞ্জ মণ্ডলের অধীনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই অঞ্চলটি ছিল কামতাপুর রাজ্যের খেন বংশীয় হিন্দু রাজাদের রাজধানী 'নগর দুর্গ'। এই বংশের প্রথম রাজা কান্তনাথ যিনি নীলধ্বজ নামেও পরিচিত। সেখানে রাজার দ্বারা দেবী মন্দির স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ সালে গৌড়ের শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামতাপুর রাজ্য ও মন্দির আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে। যদিও তা ক্ষণস্থায়ী ছিল। শোনা যায়, রাজা নাগাক্ষ ও অসমের জনগণ হোসেন শাহের বাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দেয়। হোসেন শাহের সৈন্য এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। এই আক্রমণের পরেই কামতাপুর রাজ্যে খেন বংশের পতন ঘটলে রাজনৈতিক শূন্যতা ও অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই শূন্যতা পূরণ হয়েছিল কোচ রাজবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে। খেন রাজবংশের স্মৃতিবিজরিত রাজপাট ঢিবি আজ বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে চলেছে। কালের নিয়মে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। যেটুকু ঐতিহাসিক নিদর্শন অবশিষ্ট আছে সেগুলির অস্তিত্ব কতদিন টিকে থাকবে তা বলা কঠিন। কারণ উপযুক্ত সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিকাঠামোর অভাব। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ মণ্ডলের অধীন এই রাজপাট ঢিবি। তাঁদের অফিস সম্প্রতি রায়গঞ্জে চালু হয়েছে। তাঁরাও যদি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে খেন রাজার দুর্গ-সহ স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক নিদর্শন যেগুলি এখনও টিকে আছে অথবা বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে, যে সম্পর্কে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও গবেষণার কাজ সহজ হবে।

১৬৬৫ সাল, শকাব্দ ১৫৮৭ কামতেশ্বরী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক জনশ্রুতি, লোককথা আছে। আবার ঐতিহাসিক উপাদানও আছে। বর্তমান পুরোহিতের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর পরিবারের পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় রথীনাথ ঝাঁ থেকে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মন্দিরে পুরোহিতের কাজ করে চলেছেন। তাঁর পরিবার অযোধ্যা থেকে গোসানিমারী এসেছিলেন। কোচবিহারের মহারাজা তাঁদের বসবাসের জায়গা দেন। আজও ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে নিত্য পূজা হয়ে চলেছে।

সমিতির পক্ষে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক বাপ্পা মহন্ত, প্রদীপ বর্মন, শুভঙ্কর দে, শিবম সাহা, চিরঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ।

বঙ্গভূমিতে প্রথম নর্তেশ্বর চিত্রকলা প্রদর্শনী

গত ১৫ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র নিবেদিত এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত ভারতীয় সংগ্রহশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হলো বঙ্গসংস্কৃতির আদিপুরুষ নর্তেশ্বর চিত্রকলা প্রদর্শনী।

এই প্রদর্শনীতে মোট ১৭ জন শিল্পীর নিজস্ব আঙ্গিক ও ঘরানাতে অঙ্কিত নর্তেশ্বরের চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নর্তেশ্বর নিছক একটি মূর্তি নয়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুপ্রেরণার উৎস। সংস্কৃতির গভীরতা ও জীবনের চিরন্তন ছন্দকে বুঝতে সাহায্য করে জেলার মেলকদম্বুর গ্রামে অমৃত ঘটেশ্বর মন্দিরে পাওয়া গেছে। বঙ্গের এই আদি নর্তেশ্বর শিবকে বর্তমান সময়ের মানুষের সঙ্গে পরিচিত করতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন।

মহাদেব শিবের নটরাজ মূর্তিরই এক রূপ হলো এই নর্তেশ্বর। ঊর্ধ্বমুখ নন্দীর পিঠের উপর বীণাধারী, জটাজুট মস্তক, স্কন্ধে নাগ উপবীত, অঙ্গ নানা অলংকারে শোভিত, দক্ষিণহস্তে গজমুদ্রা, বামহস্তে অভয়মুদ্রা। তাঁর পায়ের কাছে গণেশ, কার্তিক-সহ নানান শিবানুচর।

এই নর্তেশ্বর মূর্তি। এই প্রদর্শনীতে যেসব বিশিষ্ট শিল্পীর চিত্র প্রদর্শিত হলো, তাঁরা হলেন গোপালচন্দ্র নস্কর, মৃগাঙ্ক মৌলি সেন, শীর্ষ আচার্য, হ্যালী গোস্বামী, অর্ক দাস, কবিতা মণ্ডল, প্রীতম সিংহ, সঙ্গীতা দাস, অনুভব দাস মৈত্রী বোস, সৌমী দাস, সুভাষ কর্মকার, দয়াময় সূত্রধর, রণিত আচার্য, লালটু চিত্রকর, নিরুপমা ট্যাঙ্ক ও পিন্টু কর্মকার। সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রথম এতজন শিল্পীর আঁকা নর্তেশ্বরের চিত্র প্রদর্শিত হলো। সংস্কার ভারতীর দৃশ্যকলা বিধার শিল্পীরা এই উদ্যোগ নেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস গিরি, প্রধান অতিথিরূপে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশেষ অতিথি রূপে ভারতীয় সংগ্রহশালার সহ অধিকর্তা ড. সায়ন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মণিপুরী নৃত্যসাধিকা বিম্বাবতী দেবী, কত্থক নৃত্যসাধিকা পারমিতা মৈত্র।

প্রদর্শনীতে অতিথিরা আদি নর্তেশ্বর শিবকে বঙ্গের মানুষের প্রধান উপাস্য তথা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে উল্লেখ করেন। সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, বিদেশি ও বিধর্মী আক্রমণকারীরা বারাবর আক্রমণ হেনেছে এই বঙ্গে। বহু মন্দির ও মূর্তি তারা ধ্বংস করে। এই আক্রমণে নর্তেশ্বরের মূর্তিগুলিও ধ্বংস হয়। মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন স্থানেই সনাতন সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। এখনও বহুস্থানে দশভুজা ও দ্বাদশভুজা নর্তেশ্বরের পূজা হয়। পূর্ববঙ্গের নাটেশ্বর ও ত্রিপুরার নাটঘর গ্রামে এখনও পূজিত হন নর্তেশ্বর শ্রীবিগ্রহ। বঙ্গের নর্তেশ্বরের মূর্তি দক্ষিণভারতে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর প্রদর্শনীতে এই বিষয়ে 'বঙ্গ সংস্কৃতির আদিপুরুষ নর্তেশ্বর' গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নর্তেশ্বর উৎসব পালনের মাধ্যমে একটি মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় সংগ্রহশালার আশুতোষ জন্মশতাব্দী সভাগৃহে। 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' সংস্থার গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয়। সভাগৃহের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর, পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী,ভারতীয় জাদুঘরের অধিকর্তা ড. সায়ন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চাসীন অতিথিদের হাতে নর্তেশ্বরের মূর্তি তুলে দেন। অতিথিদের বক্তব্যের পর ভারতীয় নৃত্যশৈলীর বিভিন্ন আঙ্গিক সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বহরমপুর শহরে পদযাত্রা

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ভয়াবহ নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা সমন্বয় সমিতির ডাকে গত ১৮ ডিসেম্বর এক পদযাত্রা ও সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ভৈরবতলা মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে এসে সভা শুরু হয়। সভা শেষে জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পেট্রাপোলে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

গত ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে নিখিল ভারত বাঙ্গালি সমন্বয় সমিতির ডাকে বনগাঁ পেট্রাপোলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দুলাল চন্দ্র বর, সোনা কুমার দাস, সুবিনয় ঘোষ, সুবীর বিশ্বাস, দেবু বর-সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি। উপস্থিত বক্তারা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ঘটে চলা নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

হিন্দুস্থান ক্লাবে শ্রীডীডওয়ানা সভার প্রীতি সম্মেলন

গত ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার হিন্দুস্থান ক্লাবে শ্রীডীডওয়ানা সভা এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি হরিমোহন বাঙ্গর। মুখ্য অতিথিরূপে ছিলেন রাজস্থানের ডীডওয়ানার বিধায়ক উনুস খান। অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন সম্পত মান্ধনা, মনোজ কাকড়া ও দেবেন্দ্র মনোত। অনুষ্ঠানে **IAS** নিধি চৌধরীকে ডীডওয়ানা গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়। সংস্থার পদাধিকারীরা তাকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, শাল, পুষ্পস্তবক, প্রশস্তিপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে অভিনন্দন জানান। তার সঙ্গে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্গীয় মগনারাম পসারী স্মৃতি শিক্ষা প্রতিভা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ডীডওয়ানা সম্মানে ভূষিত হয়ে শ্রীমতী নিধি চৌধরী উপস্থিত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে বলেন, কঠিন পরিশ্রম বিনা লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অভাব ও অনটনের মধ্যেও তিনি নিজে কীভাবে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন, তার উদাহরণ দেন। অনুষ্ঠানে ডীডওয়ানা প্রবাসী লোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। মহিলা ও ছোটোদের সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো ছিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সচিব হরীশ তিওয়ারী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণপ্রকাশ মল্লাবত।

এক জাতীয় বীর লাচিত বরফুকন

গিরিরাজ দে

অসীম সাহসী ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের চিরন্তন আদর্শ মহাবীর লাচিত বরফুকনের জন্ম ১৬২২ সালের ২৪ নভেম্বর অসমের চরাইদেও অঞ্চলে। পিতা মমাই তামুলি বরবরুয়া ছিলেন অহোম রাজ্যের প্রথম বরবরুয়া এবং পাইক প্রথার প্রতিষ্ঠাতা। মাতা ছিলেন নাগেশ্বরী আইদেও।

পিতার ছত্রছায়ায় লাচিত বরফুকন শৈশবকাল থেকে ধীরে ধীরে সামরিক ও অসামরিক সব শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। তাঁর প্রখর মেধা, সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা, সর্বোপরি শৃঙ্খলাবোধ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লাচিত বরফুকনের জন্মের বেশ কিছু বছর আগে থেকেই (১৬১৫) মুঘল শাসক এবং অহোম রাজার মধ্যে প্রায়ই সংঘাত লেগে থাকত। এধরনের পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা লাচিত বরফুকনকে ভবিষ্যৎ যে একজন সংগ্রামী দেশভক্তরূপে পাবে, তা আর আশ্চর্য কী।

১৬৬১ সালে মিরজুমলা অহোম রাজ্য আক্রমণ করে রাজধানী-সহ বেশ কিছু অংশ মুঘলদের কুক্ষিগত করেন। অহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহকে ১৬৬৩ সালে ঘিলাঝারিঘাট চুক্তি করতে বাধ্য করেন তিনি। যুদ্ধে পরাজয় আর চুক্তির কিছু অপমানজনক শর্ত আরোপে হতাশায় রাজা জয়ধ্বজ সিংহ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তাঁর উত্তরাধিকারী চন্দ্রধ্বজ সিংহকে বলেছিলেন, আমার মাতৃভূমিকে এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করো। রাজা চন্দ্রধ্বজ সিংহের চোখ সেদিন মাতৃভূমিকে লাঞ্ছনামুক্ত করার যোগ্য প্রধান সেনাপতিকে চিনতে ভুল করেননি। তিনি লাচিত বরফুকনের হাতে তলোয়ার দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। লাচিত পরম নিষ্ঠায় পরাজিত, বিধ্বস্ত, হতোদ্যম অহোম সেনাবাহিনীকে পুনরায় সুগঠিত করে তুলে ১৬৬৭ সালে মুঘলদের যুদ্ধে পরাজিত করে গুয়াহাটির ইটাখুলি দুর্গ দখলে নেন। প্রায় দু'মাস দুর্গটি ঘেরাও করে রাখার পর এক শীতের রাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে গুয়াহাটির মুঘল ফৌজদার ফিরোজ খানকে বন্দি করে তিনি দুর্গের দখল নেন।

মুঘলদের পরাজয়ের খবরে ক্রোধে উন্মত্ত মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব বিশাল সেনাবাহিনী সমেত সেনাপতি রাম সিংহকে অহোম রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১৬৬৯ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে মুঘল সৈন্য গুয়াহাটির কাছে এসে পৌঁছলে বীর লাচিত গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। প্রশিক্ষিত বিশাল মুঘল

সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে যাওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে, সেটা প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সেনাপতির বুঝতে ভুল হয়নি। অহোমের পাহাড়, জঙ্গল ও শরাইঘাটের মধ্য দিয়ে চলা ব্রহ্মপুত্র গেরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত এই পরিবেশকে যথাযোগ্য কাজে লাগিয়ে বীরসেনা অবিরাম মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তারপর ভয়ানক বর্ষা এসে মুঘলদের আরও বিপর্যস্ত করে তুলল।

একটি ঘটনা না বললে এই দেশভক্ত বীরসেনার গৌরবগাথা অসমাপ্ত থেকে যাবে। মুঘল সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য লাচিত বরফুকন আমিনগাঁওয়ের কাছে একটি দুর্গ তৈরির দায়িত্ব নিজের মামার ওপর দিয়েছিলেন। কিন্তু দায়িত্বে অবহেলা করার জন্য দুর্গের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় লাচিত প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন এবং তলোয়ারের এক কোপে নিজের মামার শিরশ্ছেদ করে বলেন— দেশের চেয়ে মামা বড়ো নয়। লাচিতের এই উগ্র মূর্তি দেখে দুর্গের কাজে নিযুক্ত মজদুরেরা ভীষণ ভয় পেয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এক রাতের মধ্যে সেই গড় বা দুর্গ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করে। সেই গড় বা দুর্গকে আজও 'মোমাই কাটা গড়' বলে জানা যায়। আজও লাচিতের সেই 'দেশের চেয়ে মামা বড়ো নয়' উক্তিটি দেশপ্রেমমূলক বাক্য বলে গণ্য হয়।

সেই সময় মুঘল সেনাপতি রাম সিংহ এক কূটনৈতিক খেলা খেলেন। তিনি প্রচার করেন যে, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে লাচিত বরফুকন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে গুয়াহাটি মুঘলদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু রাম সিংহ জানতেন না, দেশপ্রেমিক ও সততার প্রতিমূর্তি লাচিত বরফুকন সম্বন্ধে দেশদ্রোহিতার কথা অহোমবাসীকে বিশ্বাস 'করানো সম্ভব নয়। কূটনৈতিক চালে ব্যর্থ হয়ে মুঘল বাহিনী আরও সৈন্য জোগাড় করে ১৬৬৯ সালের ৫ আগস্ট আলাবাইয়ে আহোম সেনার সম্মুখীন হয়। এক ভয়াবহ যুদ্ধে চরম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও অহোম সেনা পরাজিত হয়।

মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় হওয়ায় সেই সময় অহোম সেনার মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল। তার ওপর সেই সময় লাচিত বরফুকন খুব অসুস্থ হয়ে ইটাখুলির দুর্গে ছিলেন। মুঘল যুদ্ধে জয়ী হলেও গুয়াহাটি তখনও মুঘলের দখলে যায়নি। ১৬৭১ সালের মার্চ মাসে গুয়াহাটি দখলের জন্য প্রস্তুত হয়ে মুঘলসেনারা আক্রমণ শুরু করার জন্য ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর দিয়ে এগিয়ে আসছিল। তারা যত এগিয়ে আসছিল আহোম সেনারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে পালাতে শুরু করেছিল। ঠিক তখনই বীর লাচিত অসুস্থ শরীরে গর্জে উঠে নৌবহর সাজিয়ে পরম বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অসুস্থ সেনাপতির তেজোদ্দীপ্ত গর্জনে পলায়নরত সৈন্যরা অসীম উদ্দীপনায় লাচিত বরফুকনের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার মুঘল শিবির লক্ষ্য করে সেই গেরিলা আক্রমণ চলে। আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ১৬৭১ সালের ৭ এপ্রিল শরাইঘাটের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে মুঘলরা। অহোম রাজ্য ত্যাগ করে। শরাইঘাট যুদ্ধের কিছুদিন পর বীর লাচিত মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

লাচিত বরফুকন এককভাবে একটি সৈন্যদল পরিচালিত করে মুঘল বাহিনীর মতো একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন, এমন বীরোচিত বিজয় ইতিহাসে বিরল। তিনি যুদ্ধে গেরিলা কৌশল, কূটনীতি, গুপ্তচর বৃত্তিকে সফলভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই অসীম বীরত্বের জন্য অসম মুঘল আগ্রাসন থেকে মুক্ত ছিল। এই স্বজনপোষণের যুগে দেশের জন্য স্বজনের বলিদানের এমন উদাহরণ ইতিহাস আছে বলে জানা নেই। তাই আজ লাচিত বরফুকনকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাঁর সামরিক কৌশল আজ দেশের সামরিক বাহিনীকে প্রেরণা জোগায়।

শত্রু শিবিরের সেনাপতি রাম সিংহ পরাজিত হয়ে ফেরার পর লিখেছিলেন— রাজার গৌরব, মন্ত্রীদের গৌরব, সেনাপতিদের গৌরব, দেশের গৌরব থাকা সত্ত্বেও আমরা হেরে গেলাম। কারণ, আঘাত হানার জন্য কোনও একটা দুর্বল স্থান বা সুযোগ পেলাম না। রাম সিংহ বোধহয় মহাবীর লাচিতের ব্যক্তিত্বকে ঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। লাচিত বরফুকন তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব, অবিচল দেশপ্রেমের জন্য অসম তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। প্রতি বছর ২৪ নভেম্বর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে সমগ্র দেশবাসী নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করে। □

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন—

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

স্বাধীনতার সিংহ বিপিনচন্দ্র পাল

দীপক খাঁ

কলকাতায় অধ্যয়নকালেই বিপিনচন্দ্র সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট ব্রাহ্মমতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পরিণতিতে তাঁকে পিতার ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে এক ব্রাহ্ম বালবিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়বার জন্য বিলাত গিয়ে ৩৫ বছর অক্সফোর্ডে থাকেন। ভারতে ফিরে আসেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তিনি 'নিউইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

তৎকালীন ভারতে যে সকল মনীষী জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। তার জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ছিল ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার সংযোগ। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁর বাগ্মিতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি কংগ্রেসের প্রগতিশীল শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নব্যবঙ্গের রূপায়ণে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়েই প্রথম ইংরেজ বিতাড়নের প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয়। কিন্তু সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর থেকে ক্রমাগত ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হতে থাকে। মহাবিদ্রোহ ছিল ভারতে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব। প্রথম বিপ্লবী ব্রাহ্মণযুবক মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুরে অশ্বত্থবৃক্ষে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে আত্মোৎসর্গ করেন। এরপর থেকেই ভারতে নানাভাবে আরম্ভ হয়ে যায় মুক্তিসাধনা। সাহিত্যেও প্রচারিত হতে লাগল স্বাধীনতার আদর্শ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন আনন্দমঠ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ভাবাদর্শের মধ্যেও তরুণ প্রজন্ম পেল স্বাধীনতার উদ্দীপনা। ভারতে সংগঠিত হলো জাতীয় কংগ্রেস।

এরই কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে সংগঠিত হলো বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি। বঙ্গদেশে গুপ্তসমিতি ও বৈপ্লবিক কাজকর্ম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হোতা শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ। এঁদেরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় বঙ্গদেশে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এর কয়েক বছর পরে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় আসেন এবং নিজেকে

সর্বতোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। বড়লাট কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলন বা বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন গড়ে তুলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে ঘুমন্ত বাঙ্গালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেন। তাঁদের কণ্ঠের জলদগম্ভীর মন্ত্র এবং অগ্নিময় ভাষণ সেদিন বাঙ্গালির প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগিয়ে তুলে। তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মানুষকে একেবারে যুদ্ধের উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

চারিদিকে আরম্ভ হলো জনসভা, মিছিল ও বিলাতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। ক্রমশ ইংরেজ সরকার আরম্ভ করলো দমন ও পীড়ন। ভয় দেখিয়ে, নির্যাতন করে, অত্যাচার চালিয়ে তাঁরা আন্দোলনকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন শত শত স্বদেশী নেতা ও কর্মী বঙ্গদেশের শহরে, পল্লীতে বক্তৃতা করে স্বদেশমন্ত্র ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বিপিনচন্দ্র ছিলেন পরিপূর্ণ স্বরাজ্যবাদী। তিনি বয়কট বা Passive resistance আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ তখন নিখিল ভারতের একচ্ছত্র নেতা। তিনি ভারতের সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করে, কংগ্রেসের পতাকাতলে নিয়ে এলেন, ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। তার আগে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রদেশকেই স্বদেশ বলে মনে করত। সমগ্র ভারতের কথা কেউ ভাবত না, নিখিল ভারতকে নিজের স্বদেশ বলে ধারণা করতে পারত না। সুরেন্দ্রনাথই তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতার দ্বারা প্রথম ভারতবর্ষে এই ধারণার সৃষ্টি করেন। সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করে, একত্র করে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করে ভারতবাসীর মনে এক অখণ্ড ভারতীয় চেতনার সৃষ্টি করলেন। তাঁর নেতৃত্বের সময়কালে এল বিরোধী এক শক্তি ও ধারণা। এই নতুন ধারণা সুরেন্দ্রনাথের ভাববাদ অপেক্ষা অধিক উগ্র, উত্তপ্ত ও অগ্রগামী। এই নতুন ভাববাদের হোতা হলেন তিনজন গণ্যমান্য নেতা। এই ত্রি-নেতৃত্বের নাম লাল-বাল-পাল। অর্থাৎ পঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বঙ্গের বিপিনচন্দ্র পাল।

এই নেতৃত্রয় সুরেন্দ্রনাথ ও তার অনুগামীদের চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের আখ্যা দিলেন মডারেট বা নরমপন্থী। নিজেদের তাঁরা আখ্যায়িত করলেন এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী দল বলে। এই লাল-বাল- পাল পরিচালিত চরমপন্থী দলেরই নেতৃত্ব পরবর্তীকালে গ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ।

চরমপন্থী দলেরই পরিপূর্ণ সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করে মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে গুপ্ত সমিতি বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক, প্রচারক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। চরমপন্থী তথা বিপ্লবপন্থীদের মুখপত্র বন্দেমাতরম পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর পরে সম্পাদক হন শ্রীঅরবিন্দ। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় বিপিনচন্দ্র কাগজের দায়িত্ব ছেড়ে দেন।

ইতিমধ্যে মানিকতলার মুরারীপুকুর বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কার হলে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দও গ্রেপ্তার হলেন। ইংরেজ সরকার সকলের বিরুদ্ধে আরম্ভ করল রাজদ্রোহিতার মামলা। সেই সময় বিপিনচন্দ্র পুনর্বার বন্দেমাতরম সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অরবিন্দের মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র মৌন অবলম্বন করলে আদালত অবমাননার দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী ও স্বরাজ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতাবলী সমগ্র দক্ষিণ ভারতে জাগরণের সৃষ্টি করে। পরের বছর তিনি পুনর্বার বিলাত যান। বিলাত অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্র Swaraj এবং Indian Student নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। Swaraj পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর The Actiology of the Bomb in Bengal প্রবন্ধের জন্য তিনি রাজরোষের কবলে পড়েন। বিলেতে তিনবছর অবস্থানের পর স্বদেশে ফিরে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক হোমরুল গঠন করলে বিপিনচন্দ্র পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি তিলকের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরের বছর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তৃতীয়বার বিলাত যান। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলে বিপিনচন্দ্র তার বিরোধিতা করেন এবং নিন্দিত হন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

চিদম্বরম পিল্লাই বিপিনচন্দ্রকে 'স্বাধীনতার সিংহ' বলে অভিহিত করেন। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত লেখাই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হলো— শোভনা, ভারত সীমান্তে রুশ, জেলের খাতা, নবযুগের বাঙ্গলা, সত্তর বছর (আত্মচরিত), চরিত্রচিত্র, সাহিত্য সাধনা, Indian Nationalism, Swaraj and the present situation, The new spirit, studies of Hinduism, the soul of India। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। □

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে এই অভ্যুত্থান অবৈধ। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে এই প্রক্রিয়ায় ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন।

ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়ে হবে না, ভারতই শেষ কথা বলবে

ধর্মানন্দ দেব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত গানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল— 'সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা এত খাঁটি, মৃত্যুর চেয়ে খাঁটি, মৃত্যুর চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটি' এবং 'এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই গানগুলো স্বাধীনতার চেতনা ও সংগ্রামের প্রতীক ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করা সেই বঙ্গে আজ অরাজকতা, খুন ও জেহাদি শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের স্থান দখল করছে মোল্লাবাদ, আর স্বাধীনতার আদর্শকে মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার জঙ্গিঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রায় ২৩৩টি মামলার মধ্যে অনেকগুলোই খুন, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত। এই অবস্থায়, তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হওয়া একটি কৌশলগত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি দীর্ঘ ও জটিল ধাপ। এটি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতির ওপর নির্ভরশীল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৩ সালে প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৬ সালে এই চুক্তি সংশোধিত হয়, যাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজ হয়। তবে চুক্তির ১০ (৩) ধারা অনুযায়ী, যদি অনুরোধ পাওয়া দেশের কাছে মনে হয় অভিযোগগুলো 'ন্যায়বিচারের স্বার্থে আনা হয়নি' বা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত', তাহলে তারা প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া খারিজ করতে পারে।

শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের আদালত যদি তাঁকে 'পলাতক' ঘোষণা করে এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, তাহলে বাংলাদেশের সরকার ভারতের কাছে তাঁকে ফেরানোর অনুরোধ জানাতে পারে। কিন্তু ভারত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেটি নাকচ করার অধিকার রাখে। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) প্রতিটি মামলার স্বচ্ছতা এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। শরণার্থী সুরক্ষা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকলে অভিযুক্তকে ফেরানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধা সৃষ্টি হতে পারে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোতে অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা ও নির্যাতনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মতে, যদি অভিযোগগুলো 'সামাজিক অপরাধ' বা 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হয়, তাহলে সেগুলো আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আসে। তবে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে আনা মামলাগুলোতে আন্তর্জাতিক আদালত প্রায়শই সতর্ক থাকে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যেসব মামলা রয়েছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল এবং ইন্টারপোল উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ করতে হবে যে, শেখ হাসিনা রাজনৈতিক পলাতক নন বরং

ন্যায়বিচারের প্রয়োজনেই তাঁর প্রত্যর্পণ জরুরি। ইন্টারপোল সাধারণত আন্তর্জাতিক অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য রেড কর্নার নোটিশ জারি করে। তবে এই নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে ইন্টারপোল অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক কী না, অভিযোগগুলো ন্যায্য কী না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশে ফেরানোর ফলে তাঁর জীবন বা মানবাধিকারের ওপর প্রভাব পড়বে কী না, সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করে।

শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ন্যায়বিচার থেকে পালিয়ে গেছেন এবং তাঁর দেশে উপস্থিতি বিচার প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগের প্রক্রিয়া নিয়ে যে ধোঁয়াশা রয়েছে, তা এই মামলাকে জটিল করে তুলবে। ইন্টারপোলের নীতিমালা অনুযায়ী, রাজনৈতিক মামলায় রেড কর্নার নোটিশ জারি করার ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সতর্ক। বিশেষ করে, যদি প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশে ফিরলে রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা জীবনহানির শিকার হতে পারেন, তবে ইন্টারপোল সেই অনুরোধ খারিজ করতে পারে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, ভারত তার কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং সুরক্ষা স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তি এবং ২০১৬ সালে চুক্তির সংশোধন ভারতকে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করে। ভারত এই চুক্তির আওতায় শর্ত অনুযায়ী তাদের অধিকারের প্রয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া, ভারতীয় বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিচার হতে পারে, যা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় থাকবে।

ভারতীয় আইনের ভিত্তিতে, প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় কোনো দেশের কাছ থেকে অপরাধীকে ফেরানোর প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ১৯৭৪ সালের Extradition Act ভারতীয় প্রত্যর্পণ আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে এবং ভারত কোনো দেশের কাছে অপরাধীকে ফেরানোর বিষয়ে যে কোনো আইনি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে, যদি ফেরানো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওই দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা করা হয়, তবে ভারত তাদের ফেরানোর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে পারে।

বাংলাদেশের সরকার ইন্টারপোলের মাধ্যমে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নির্ধারিত হবে ভারতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থানের ওপর। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্ক ও পরস্পরের মধ্যে অভিন্ন প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। এর আওতায়, ভারতের পক্ষে এই চুক্তি মেনে বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে ও আইনি দিক থেকে ভারত বর্তমানে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ থাকলেও, শেষ কথা বলবে ভারত সরকার। গত ১০ নভেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে আওয়ামি লিগ নেতা এবং সিলেটের প্রাক্তন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস, ইউনুসের ক্যাবিনেটের সব সদস্য এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে আইসিসিতে একটি মামলা দায়ের করেছেন, মামলার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ৮০০ পৃষ্ঠার নথি। গত ৫-৮ আগস্ট, বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থান চলাকালীন বাংলাদেশের পুলিশবাহিনী, আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী-সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়, সেদেশ জুড়ে যে পরিমাণ গণহত্যা সংঘটিত হয় তা সাম্প্রতিক অতীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ বলে দাবি করে ইউনুস প্রশাসনকে অবৈধ ঘোষণার দাবি এই মামলায় করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে এই অভ্যুত্থান অবৈধ। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে এই প্রক্রিয়ায় ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনও। ইউনুস প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা মারাত্মক অভিযোগ সংবলিত আরও ১৫ হাজার আবেদন শীঘ্রই আইসিসিতে দায়ের হতে চলেছে বলেও আওয়ামি লিগের ফেসবুক পেজে দাবি করা হয়েছে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক জেহাদি আন্দোলনের লক্ষ্য 'অখণ্ড ইসলামি বাংলা'

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান না আফগানিস্তান? স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর গত জুলাই-আগস্টে তথাকথিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার জঙ্গি আন্দোলনের পর বাংলাদেশের গন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছাত্র নেতাদের বক্তব্য ৭ মার্চের ছুটি বাতিল এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের ধারা ও নানা পদক্ষেপ একটি উগ্র ইসলামি দেশের দিকেই এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। কিন্তু গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে জেহাদি আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুসের ঘনিষ্ঠ মাহফুজ আলম আরও ভয়ংকর এক কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। সে ভারতকে ঘিরে এক 'অখণ্ড বাংলা' গঠন করার কথা বলেছে। আর অবশ্যই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তাদের স্বপ্নের এই 'বাংলা'।

মাহফুজ এখন ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সরকারের শীর্ষ নীতিনির্ধারকদের একজন। ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার এই 'অখণ্ড বাংলা'র স্বপ্ন লালন করেন কিনা, সমর্থন করেন কিনা, তা এখানও ধোঁয়াসা। তবে আন্দোলরে মাস্টারমাইন্ড এবং নীতিনির্ধারকদের একজনের বক্তব্য বাংলাদেশকে অন্য এক অবস্থানে স্থাপন করেছে, এই অঞ্চলে এক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি সামনে নিয়ে এসেছে।

আলোচনায় যাওয়ার আগে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ভারতে চলে যান। বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী জেহাদি ছাত্রনেতাদের নির্দেশে শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে হামলা ও লুটপাট চালানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সারাদেশে মুজিবের মূর্তি ভাঙা হয়। একই সঙ্গে অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের মূর্তিও ভাঙা হয়। মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে একাত্তরের ২৩ মার্চ স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রবল হিংস্রতায় বাঙ্গালিদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর এই ঐতিহাসিক বাড়ি থেকেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের পরাজয়ের সূচনা এখান থেকেই।

জেহাদি ছাত্রনেতারা পাকিস্তানের পরাজয়ের সূচনা যেখান থেকে হয়েছিল সেটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রচণ্ড এক আক্রোশে। এ থেকেই তাদের কথিত আন্দোলনের চরিত্র বোঝা যায়। ৩২ নম্বর বাড়ি ছিল বাঙ্গালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার, যে আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। বাঙ্গালিরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলায়। পাশে ছিল ভারত। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিল। আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়ে তিরানব্বই হাজার পাকস্তানি সেনা-সহ ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক লে জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি। রেসকোর্সের যে স্থানে পাকিস্তানি জেনারেল আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেছিলেন সে স্থানটি বাঙ্গালির গৌরবের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে এই স্থানে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান হতো। দাবি ছিল এখানে স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার পর পাকিস্তানি বশংবদ জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানের পরাজয়ের চিহ্ন মুছে ফেলতে এই স্থানে একটি আধুনিক শিশু পার্ক তৈরি করেন। এই জিয়াউর রহমান পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক সংবিধানকে ইসলামি সংবিধানে রূপ দেন।

> **ছাত্রনেতারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও তাদের পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম, নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরির-সহ ইসলামি দলগুলো। ছিল বিএনপিও। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন তো ছিলই।**

যে ইসলামীকরণের কাজ শুরু হয়েছিল প্রথমে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং পরে জেনারেল হুসেইন মহম্মদ এরশাদের হাত ধরে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামি লিগ আমলে তা প্রতিরোধ করা হয়নি। বরং ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঢাল রেখে উগ্র ইসলামি ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়েছে ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে। সংবিধানে এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজনাকে অব্যাহত রাখা, প্রতিটি উপজেলায় সরকারি খরচে সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ, হেফাজতে ইসলামকে খুশি করতে তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া এবং কওমি মাদ্রাসার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দান-সহ অসংখ্য উদাহরণ টানা যায়। কওমির স্বীকৃতির জন্য শেখ হাসিনাকে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সংগঠন 'কওমি জননী' আখ্যা দিয়েছিল। অথচ শেখ হাসিনার পতনের জন্য জেহাদি আন্দোলনে এই কওমিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ইসলামি ধারা প্রবল গতি পেল গত ৫ আগস্ট জেহাদি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। গত ১৫ বছর আওয়ামি লিগের

শাসনে ইসলামের প্রতি দুর্বলতার আড়ালে এই উগ্র ধারা অত্যন্ত গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেছে। পাকিস্তান সেই একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। লক্ষণীয়, জেহাদি ছাত্র-নেতারা তাদের ভাষায় জুলাই- আগস্ট বিপ্লবের পর ৫ 'আগস্টকে' স্বাধীনতা দিবস আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ একাত্তরে পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীনতা লাভকে বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে জেহাদি ছাত্রনেতাদের অবস্থান ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল। জেহাদি ছাত্র- জনতার এই আন্দোলনকে বৈষম্যবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু শুরুতেই ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়। বঙ্গভবনে মহম্মদ ইউনুসের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শুধু কোরান পাঠ করা হয়। অন্য কোনো ধর্মের স্থান হয়নি। বিশাল উপদেষ্টা পরিষদে মাত্র একজন হিন্দু ও একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যকে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু ভদ্রলোক দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য পেয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলের ভার। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম মুখ্যত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। গত ২ ডিসেম্বর কুমিল্লার মুরাদনগরে এক অনুষ্ঠানে ছাত্রনেতা ও ড. ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আসিফ ভুঁইয়া গীতাপাঠ করতে দেননি। দেশে সংবিধান সংস্কার-সহ ১০টি কমিশন গঠন করা হয়। কোথাও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থান হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে হিন্দুদের সরিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা চাকরি থেকে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশে কোনো উচ্চ পদে এখন কোনো হিন্দু নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক হারে হিন্দুদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থায় যেসব হিন্দু উচ্চপদে ছিলেন তাদের চাকরি হারাতে হয়েছে। এই হচ্ছে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের ফসল। নোবেল শান্তি বিজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুস বলেছেন, তিনি বাংলাদেশকে এক পরিবার হিসেবে দেখতে চান। তিনি স্বীকার করেছেন, হিন্দুদের পূজা করতে হয় পুলিশ পাহারায়। অথচ তাঁর সরকার হামলার ঘটনা অস্বীকার করছে।

আরও উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তাঁর ভারতে চলে যাওয়ার পর ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় ঢাকায়। সেখানে পাকিস্তানি দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথি ছিলেন। একাত্তর সালে বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পর এই প্রথম জিন্নাকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। কয়েকদিন পর পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। সংবাদপত্রে এ নিয়ে বিস্তারিত খবর হয়েছে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত খালেদার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করেন তখন পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারমার্সনের বিরুদ্ধে সব সাজা প্রত্যাহার হয়নি। গত ৫৩ বছরে পাকিস্তানি কূটনীতিকদের তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি, সাম্প্রতিক জেহাদি আন্দোলন একাত্তরের পরাজিত দেশটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের কথা ঘোষণা করেছে। গত ৫৩ বছরে বৃত্তির কথা তাদের মনে পড়েনি। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাকিস্তানি জাহাজ সরাসরি এখন চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে শুরু করেছে।

মূল গন্তব্য ফাঁস করলেন মাস্টারমাইন্ড

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও ছাত্র-জনতার তথাকথিত বিপ্লবের অন্যতম নায়ক মাহফুজ আলম গত ১৬ আগস্ট তার ভেরিফায়েড পেজে একটি বক্তব্য দিয়েছেন। এই সেই মাহফুজ আলম, যাকে সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানকালে এক অনুষ্ঠানে ড. ইউনুস কথিত জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের 'মাস্টারমাইন্ড' বলে সাংবাদিকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মাহফুজ তখন ড. ইউনুসের বিশেষ সহকারি ছিলেন, পরে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে তাকে উপদেষ্টা পরিষদে স্থান দেওয়া হয়। সেই মাহফুজ আলম ভেরিফায়েড পেজে ছাত্র-জনতার কথিত বিপ্লবের লক্ষ্য পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'অখণ্ড বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই-আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ভারতের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে ১৯৭৫ এবং ২০২৪ বিপ্লব (২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লব, যা ছাত্র-নেতারা জুলাই বিপ্লব বলে অভিহিত করেন, ঘটাতে হয়েছে। ২০২৪ মাত্র শুরু, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জনপদ আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে।'

এই বক্তব্যের সঙ্গে মাহফুজ একটি মানচিত্র দিয়েছেন, যাতে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের সাতটি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যে মানচিত্র সামনে এসেছিল, সোহরাওয়ার্দি, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি-আসবে না। আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

অবশ্য মাহফুজের এই বক্তব্য নিয়ে দেশে-বিদেশে সমালোচনা শুরু হলে, মাত্র দু'ঘণ্টা পর তিনি ভেরিফায়েড পেজ থেকে তা সরিয়ে নেন। কিন্তু এরই মধ্যে কথিত জুলাই বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ভয়ংকর সত্য বেরিয়ে পড়েছে। ছাত্রনেতাদের আরও দুজন নাহিদ ইসলাম ও আসিফ উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন। মাহফুজ, নাহিদ ও আসিফ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার এখন শীর্ষ পদে রয়েছেন। মাহফুজের বক্তব্য সম্পর্কে সরকারের মনোভাব এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। স্বাভাবিকভাবে সরকারের নীরবতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

কথিত বিপ্লবের নায়কদের পরিচয়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ব্যানারে আন্দোলন বা বিপ্লবে যারা শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটালো, তাদের ভাষায় 'বাংলাদেশ আবার স্বাধীন হলো।' কিংবা পরিবর্তিত বক্তব্যে স্বাধীনতা সুরক্ষিত হলো, তাদের পরিচয় জানা দরকার। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে প্রায় দেড়শোজন সমন্বয়কারীর কথা বলা হলেও যাদের নাম সামনে চলে এসেছে তাদের মধ্যে আছেন মাহফুজ আলম, নাসির পাটওয়ারী, আখতার হোসেন, নাহিদ ইসলাম, আসিফ ভুঁইয়া, সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লাহ, আবদুল কাদের প্রমুখ।

একথা সত্যি যে, ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার পনেরো বছরের টানা শাসনে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কার্যত দলদাসে পরিণত হয়েছিল। বিরোধী রাজনীতিকরা নির্বাচনে অংশই নিতে পারেননি। মামলা দায়ের, গ্রেপ্তার

ও সভাসমাবেশ করতে না দেওয়া সরকারের নীতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে দলীয় নেতা ও ব্যবসায়ীদের নির্বিচারে টাকা লুটপাট ও বিদেশে পাচার, সর্বস্তরে দুর্নীতি, বড়ো বড়ো প্রকল্প থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার দাপট এসব কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের একেবারে নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই সুযোগটা নেয় মূলত জেহাদি ছাত্ররা। তারা আন্দোলন শুরু করেছিল সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে। এই আন্দোলন অবসানে সরকার আলোচনার পথে না গিয়ে প্রথমে দল ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের ক্যাডারদের ব্যবহার করে, পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেয়। এতে হতাহতের সংখ্যা বাড়ে। ছাত্রদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষও যুক্ত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ রাজধানীতে ছুটে আসে। শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীকে মাঠে নামিয়ে আরও কঠোরতার পথে যেতে চেয়েছিলেন, সান্ধ্যআইনও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে যেতে রাজি হয়নি। পতন ঘটে শেখ হাসিনা সরকারের।

তবে ছাত্রনেতারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও তাদের পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম, নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরির-সহ ইসলামি জঙ্গি দলগুলো। ছিল বিএনপিও। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন তো ছিলই। ছাত্রনেতাদের একটি বড়ো অংশ মাদ্রাসা থেকে এসেছেন। 'মাস্টারমাইন্ড' বলে ড. ইউনুসের ঘনিষ্ঠ মাহফুজ আলম হিযবুত তাহরিরের নেতা। সংবাদমাধ্যমে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রত্যাশিত হয়েছে। এই হিযবুত তাহরিরের নামে সম্প্রতি প্রচারিত এক রঙিন পোস্টারে ভারতকে শত্রুদেশ ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। এর মাসখানেক আগে প্রচারিত আরেক পোস্টারে বাংলাদেশে 'খেলাফত শাসন' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে মুসলমানদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। এগিয়ে আসতে বলা হয় সেনাবাহিনীকে।

জেহাদি বিপ্লবের নেতারা এখন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তারা গঠন করেছে 'জাতীয় নাগরিক কমিটি'। এখন সারাদেশে এই কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানো হচ্ছে, প্রতি জেলা উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে শাখা গঠন করা হচ্ছে। মূলত এই তৎপরতায় ভূমিকা রাখছে মাদ্রাসার ছাত্ররা। নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব হয়েছেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনের দুই নেতা নাসির পাটওয়ারী ও আঘতার হোসেন।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করাই লক্ষ্য

গত ৫৩ বছরে হিন্দুদের ওপর অত্যাদারের কোনো হামলার বিচার হয়নি— এই 'অভিযোগ বাংলাদেশের দুই প্রধান সংখ্যালঘু সংগঠন' বাংলাদেশ 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' এবং 'বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের'। স্বাধীনতার পর এই পাঁচ দশকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তারাই হিংসাত্মক হামলার ঘটনা অস্বীকার করেছে। সে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগই হোক আর আওয়ামি লিগ বিরোধী বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামিই হোক। এই একটা ব্যাপারে সবাই দল-মত নির্বিশেষে এক লাইনে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভাষায় বলা যায়, 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে দুর্গাপূজার সময় স্বাধীন দেশে প্রথম হিন্দুদের ওপর হামলা হয়, দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ১৯৯০, ১৯৯২, ২০০১, ২০১৩, ২০১৪, ২০২১ সালে দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা কখনো নির্বাচন পূর্বাপর সময় কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ার অভিযোগে, কখনো কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে বা অন্য কোনো অজুহাতে সংখ্যালঘুদের সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে।

> **জিয়াউর রহমান, হুসেইন মহম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলের মতোই শেখ হাসিনার আমলেও আজও হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কখনো অস্বীকার করা হয়েছে, কখনো বলা হয়েছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা।**

তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, পুরোহিত-ভিক্ষু- পাদরি হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, দেশত্যাগের হুমকি, ধর্মান্তরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্যাতন- নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনার তদন্তে ২০০৯ সালে আওয়ামি লিগের শাসনামলে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশন হত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে কয়েকশো লোকের সংশ্লিষ্টতার তথ্য তুলে ধরে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলেও রহস্যজনক কারণে তৎকালীন আওয়ামি সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আওয়ামি লিগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রায় দেড় দশক শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুরা সহিংসতার শিকার হয়েছে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরেছে। জিয়াউর রহমান, হুসেইন মহম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলের মতোই শেখ হাসিনার আমলেও আজও হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কখনো অস্বীকার করা হয়েছে, কখনো বলা হয়েছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। জেহাদি ছাত্র-জনতার কথিত বিপ্লবের পরও হামলার ঘটনায় একই সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার কখনো বলা হচ্ছে অতিরঞ্জিত, কখনো বলা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশের সংবাদমাধ্যমের অপপ্রচার। এবার আর একটা নতুন কৌশল যুক্ত হয়েছে, নেত্র নিউজ বলে একটা সংস্থা দাঁড় করানো হয়েছে। তাদের দিয়ে বলানো হচ্ছে ঐক্য পরিষদের অভিযোগ সঠিক নয়। গত ৫৩ বছরে সব সরকারই বলে এসেছে এমন কথা।

এ নিয়ে আওয়ামি লিগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামি-সহ ইসলামি দলের ঐক্য অসাধারণ। বামেদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই যদি থাকবে, ১৯৭১ সালে যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার ছিল ১৯.৮ শতাংশ, ২০২২ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই হার এত কম হবে কেন? ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের হার কমে না বাড়ে? এতে এই সত্যিটাই কী সামনে আসছে না যে, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য না হলে বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জিত হবে না? □

অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য

পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক মহা ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সবসময় যাগযজ্ঞ দান-ধ্যান নিয়ে থাকতেন। একবার যজ্ঞ করার সময় পুরোহিত যজ্ঞের ধোঁয়ায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। তার চোখ এমনই জ্বালা করতে থাকে যে তার পক্ষে যজ্ঞ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তিনি সবিনয়ে রাজাকে তার অপারগতার কথা বলেন।

হঠাৎ মাঝপথে যজ্ঞ বন্ধ করে দিলে মহা অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় রাজা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন যজ্ঞের ঋত্বিকরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন মহাদেবের তপস্যা করতে। তিনিই এর বিহিত করে দেবেন।

রাজা শ্বেতকি মহাদেবের তপস্যায় বসে পড়লেন। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব সশরীরে ভক্তের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। বল কী বর চাও? শ্বেতকি মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বললেন, প্রভু আপনি অনুগ্রহ করে দেখা দিয়েছেন এটাই আমার পরম পাওয়া। অন্য কিছুই আমি চাই না শুধু আপনি আমার অসমাপ্ত যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে রাজি হন। মহাদেব হেসে বললেন, এ তো হতে পারে না। আমি দুর্বাসাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি তোমার যজ্ঞ সমাপন করবেন।

মহাদেব চলে গিয়ে দুর্বাসা ঋষিকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সেই যজ্ঞ চলল সুদীর্ঘ বারো বছর। এর বারো বছরে ক্রমাগত ঘৃত পানের ফলে অগ্নিদেব অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হলেন। শুয়ে বসে শান্তি নেই, প্রাণ আইঢাই। শেষে রোগটা অসহ্য হয়ে উঠতে অগ্নিদেব ছুটলেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। করজোড়ে নিজের রোগের কথা জানিয়ে বললেন, প্রভু, আর তো পারি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন।

অগ্নিদেবের কথা শুনে ব্রহ্মা হেসে বললেন, যার কখনোই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তারই এমন ক্ষুধামান্দ্য! এ তো ভালো কথা নয়। তুমি এখনই খাণ্ডববনে চলে যাও। সেই বন দহন করলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। পিতামহকে প্রণাম জানিয়ে অগ্নিদেব হাজির হলেন খাণ্ডববনে। তারপর তাকে গ্রাস করতে লেলিহান জিহ্বা বাড়ালেন। কিন্তু হায়, গ্রাস করতে পারলেন না।

পারবেন কী করে! নাগরাজ বাসুকির ভাই তক্ষক যিনি অনন্তনাগ নামেও পরিচিত, তার সঙ্গে ইন্দ্রের দারুণ বন্ধুত্ব। তিনি তার বন্ধুকে এই বনে থাকবার ব্যবস্থ করে দিয়েছেন। ফলে এই বনকে রক্ষা করার দায়িত্বও পালন করেন তিনি। অগ্নিদেব যতবার খাণ্ডববন গ্রাস করতে উদ্যত হলেন, ততবারই ইন্দ্রের শত শত হাতি শুঁড়ে করে এবং বহু মস্তক বিশিষ্ট নাগেরা জল ছিটিয়ে অগ্নিদেবের চেষ্টা বিফল করে দিতে থাকল। পর পর সাতবার দহনের চেষ্টা করেও যখন সফল হতে পারলেন না।

তখন অগ্নিদেব আবার ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। জানালেন তার ব্যর্থতার কথা। ব্রহ্মা বললেন, তুমি এককাজ কর বাপু। কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে যাও। তারা তোমাকে এই কাজে সাহায্য করতে পারবেন।

অগ্নিদেব হাজির হলেন কৃষ্ণার্জুনের কাছে। তাঁদের সবিস্তারে জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলেন। কৃষ্ণার্জুন বললেন, আপনাকে সাহায্য করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যে বন ইন্দ্রদেব রক্ষা করছেন সেই বনের রক্ষীদের সঙ্গে যে লড়াই করব তেমন অস্ত্র তো আমাদের নেই। আমাদের মনে হয় আপনি বরুণদেবের শরণাপন্ন হয়ে যদি আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এনে দেন, তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

এবার অগ্নিদেব ছুটলেন বরুণদেবের কাছে। বরুণদেব অগ্নিদেবের দুঃখে বিগলিত হয়ে অর্জুনের জন্য দিলেন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ আর শ্রীকৃষ্ণের জন্য দিলেন কৌমদকী গদা ও সুদর্শন চক্র। অগ্নিদেব সেই অস্ত্রসম্ভার নিয়ে গিয়ে তুলে দিলেন কৃষ্ণার্জুনের হাতে। তখন সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডববনে গিয়ে প্রবল বিক্রমে অগ্নিদেবকে সাহায্য করতে লাগলেন। অগ্নিদেবও পনেরোদিন ধরে খাণ্ডববন দহন করে তার অগ্নিমান্দ্য রোগ দূর করলন। সেই সময়ে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক বনে ছিলেন না, ফলে তিনি বেঁচে গেলেন।

শ্যামাপদ সরকার

জাতীয় উদ্যান

দিহিং পাটকাই

অসম রাজ্যের ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া জেলার মধ্যে অবস্থিত দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক। ২০০৪ সালে অসম সরকার এটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে। ৫৭৫ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃতি এই উদ্যানের। এটি ভারতের সর্ববৃহৎ নিম্নভূমি রেইনফরেস্ট। এখানের জীববৈচিত্র্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তারফলে বন্যপ্রাণীর আদর্শ আবাসস্থল। এখানে ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৪৭ রকমের সরীসৃপ, ৩১০ রকমের প্রজাপতি এবং ২৯৩ রকমের পাখি রয়েছে। নানা রকমের অর্কিড ও ব্রোমেলিয়াড দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ফার্ন, এপিফাইটিস, বন্য কলা উৎপন্ন হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৪৯

আকারান্ত - স্ত্রীলিঙ্গ

সা - তা: (সে— তারা)

সা কা: ? (সে কে?)

তা: কা: ? (তারা কারা?)

সা শিক্ষিকা। -- তা: শিক্ষিকা:।

(তিনি শিক্ষিকা— তাঁরা শিক্ষিকা।)

অভ্যাস কুর্ম:-

সা বালিকা -- তা: বালিকা:। সা বৈদ্যা-- তা: বৈদ্যা:। সা গায়িকা--তা: গায়িকা:। সা সেবিকা--তা: সেবিকা:। সা লেখিকা--তা: লেখিকা:।

প্রযোগ কুর্ম:-

(মহিলা,নায়িকা, পালিকা, পরিচারিকা)

(দ্বিচক্রিকা, মালা, পত্রিকা, পেটিকা, শাটিকা, ছুরিকা, মক্ষিকা, পিপীলিকা, দোলা)

ভালো কথা

শীত

আমাদের পুরুলিয়ায় খুব শীত পড়ে। এবারও খুব শীত পড়েছে। সবাই জবুথবু। এসময় আগুন আমাদের খুব প্রিয়। আমার ঠাকুমার খাটিয়ার তলায় একটা মাটির পাত্রে সবসময় আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। রোদ উঠলে খাটিয়া সমেত কিছুক্ষণ রোদে রাখতে হয়। রাত্রিবেলায় ঠাকুমার খাটিয়ার তলায় আগুনের কাছে আমাদের দুটো কুকুর আর তিনটে বেড়াল শুয়ে থাকে। সকালবেলা সবাই বাড়ির বাইরে আগুন পোহাই। আগুনের চারপাশে সবাই গোল হয়ে বসি। পাড়ার অনেকে আসে। তারপর রোদ উঠলে ঘরে গিয়ে পড়তে বসি। গরম ছাইয়ের মধ্যে পাড়ার অনেক কুকুর শুয়ে থাকে। শীতের সময় ওদেরও খুব কষ্ট।

স্নিগ্ধা মহান্তি, নবম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভালো নয়

সায়ন্তন সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া

শীতটা কিন্তু ভালো নয়
শীতে আমরা কষ্ট পাই
তোমাদের কাছে শীতটা ভালো
আমাদের যে কিছুই নাই।
শীতটা কিন্তু ভালো নয়
শীতকে আমরা ভয় করি
শীতের দিনে কাজ পাওয়া দায়
কাজ না পেলে খিদেয় মরি।

শীতটা কিন্তু ভালো নয়
শীতেও আমরা রাস্তায় ঘুমোই
বাড়িঘর নেই যে আমাদের
তোমাদের তা জানা নাই।
শীতটা কিন্তু ভালো নয়
শীত আমাদের অরি
তোমরা যতই গালি দাও
গরমকালকেই বন্ধু করি।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতির ইতিহাস এবং আগামীদিনের সম্ভাব্য বিপদ

সুদীপ্ত গুহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবীতে আর্থিক সমৃদ্ধি একটি দেশের মূল শক্তির মাপদণ্ড। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ রেখে গেছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয়। সিঙ্গাপুর পাকিস্তানের চেয়ে অনেক ছোটো দেশ কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা সবকিছুতেই সিঙ্গাপুরের কথা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটকের কথার গুরুত্ব দিল্লিতে অনেক বেশি। কারণ তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি রয়েছে। ইহুদিদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা এক ডজন ইসলামি দেশের কারও নেই, কারণ তাঁদের রয়েছে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বাংলাদেশ শিল্প ও ব্যবসায় মাঝে সামান্য উন্নতির মাধ্যমে অর্থশক্তিতে কিছুটা উন্নত হয়। ভারত সরকার এবং বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় তারা মেট্রো রেলের মতো পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-সহ পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প, বস্ত্রশিল্প, সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ইত্যাদিতে যুক্ত ছিল। বাংলাদেশের গ্রোথ রেট বা আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল প্রায় ভারতের সমান। গত ৫ আগস্টের জেহাদি অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশি অর্থনীতি গুঁড়িয়ে গেলেও মার্কিন ডিপ স্টেটের মদতে তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে এতো বড়ো মাপের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সংখ্যালঘু হত্যার পরেও, বাংলাদেশকে কোণঠাসা করার আগে দশবার ভাবছে আন্তর্জাতিক মহল।

দেশটি এই মুহূর্তে অনেকাংশেই বিদ্যুৎহীন। কোল্ড স্টোরেজে ইলিশ পচে যাওয়ার কারণে তা ফরমালিনে সংরক্ষণ করে তারা ভারতে রপ্তানি করেছে। বিদ্যুৎহীনতার কারণে তাদের বহু কলকারখানাও বর্তমানে বন্ধ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেখানে অগ্নিমূল্য। জেহাদি জিগির তুঙ্গে উঠলেও খাদ্যদ্রব্য সেদেশে হয়ে উঠছে অমিল। ভারত সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া হওয়ার কারণে গোরু পাচার হয়েছে নিয়ন্ত্রিত। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম— সবকিছুর জন্যই তারা হাত পাতছে নয়াদিল্লির কাছে। অথচ সেই দেশের জেহাদি প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা-সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বড়ো অংশ দখলের স্বপ্নে বিভোর, ভারত তাদের তিন দিক থেকে ঘিরে রাখার পরেও। ভারত যে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তর অর্থশক্তি এবং চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তি, এর মূল কারণ অর্থনীতি ও বাণিজ্যের উপর স্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

বাংলাদেশিরা ডাক্তার দেখাতে হয়তো কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে লাইন দিতে পারে, কিন্তু অর্থনীতির ধারণা তাদের সরকারের কাছে ছিল কিছুটা হলেও স্পষ্ট। অমর্ত্য সেন বা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বাংলাদেশের উন্নতিকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে যদিও প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, যে ভারতের অর্থনীতি ভুল পথে চলছে, কিন্তু সত্যটা হলো বাংলাদেশ সরকার এবং তাঁদের কর্পোরেট সংস্থাগুলি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করত, তা অভিজিৎবাবুর তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং তাঁর মিল পাওয়া যায় নির্মলা সিতারামণ এবং শক্তিকান্ত দাস অনুসৃত অর্থনীতির সঙ্গে। এই সত্যটা স্বীকার করে নিতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়, সেটা হলো শেখ হাসিনা এই রাস্তায় ২০১১-পরবর্তী পর্যায়ে কিছুটা এগিয়েছিলেন। বাংলাদেশের গত পাঁচ দশকের সাফল্য বলতে এটুকুই।

দুই বঙ্গের অর্থদর্শনের তুলনা করতে গেলে প্রথমেই একটা ঘটনার উল্লেখ করতেই হয়। আজ থেকে প্রায় আড়াই দশক আগের একটা খবর। বাংলাদেশের নোবেল লরিয়েট ব্যাংকার এবং তৎকালীন গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ড. ইউনুস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অসীমবাবু বললেন, তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংককে কাজ করতে দেবেন যদি সরকারের হাতে ৫১ শতাংশ শেয়ার থাকে। ড. ইউনুস বললেন সরকারের হাতে ১ শতাংশ শেয়ার থাকলেও চলবে না। ড. দাশগুপ্ত বললেন ৪৯ শতাংশ। মানলেন না ড. ইউনুস। নামতে নামতে ১০ শতাংশে আসেন ড. দাশগুপ্ত। ড. ইউনুস রাজি হলেন না। সম্পূর্ণ বেসরকারি না হলে ওই সংস্থার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হলো না গ্রামীণ ব্যাংক।

এই নিবন্ধ দু'টি ভাগে ভাগ করছি বোঝার সুবিধার জন্য। প্রথম ত্রিশ বছর, অর্থাৎ দেশভাগ থেকে মুজিব হত্যা বাংলাদেশে, দ্বিতীয়টি আটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত।

পাকিস্তানের কাছে পূর্ববঙ্গ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল দুয়োরানির মতো। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আয় করা টাকা চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। ইসলামাবাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করত বাংলাভাষীদের সঙ্গে। প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, সেনাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সব ক্ষেত্রেই তারা ব্রাত্য। তারা কাজ করতো, ফল পেত পশ্চিম পাকিস্তান। তারপর শুরু অত্যাচার। সেই সময় ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। আমেরিকা এই অত্যাচারকে প্রচ্ছন্ন মদত করছিল। হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এবার পূর্ব

> যেদিন জেহাদিরা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে ফেলবে, সেদিন তাদের উপর কোনো প্রতিবেশী দেশ— বাংলাদেশি জেহাদ প্রতিরোধে, নিজেদের সুরক্ষায় কিছু ঘটালে সবাই চোখ বুজে থাকবে।

পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিলেন। সোভিয়েত সহযোগিতায় ভারত স্বাধীন করে দিল তাদের দেশ। এরপরেও ওই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কমেনি। মুজিব হত্যা, জিয়াউর রহমান হত্যা, এরশাদ সাহেবের একনায়কতন্ত্র চলল আরও প্রায় দেড় দশকের বেশি। কিন্তু ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশের সাফল্য সামান্যই। যে বাংলাদেশকে একসময় পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ হিসেবে গণ্য করা হতো, তা ২০১১-পরবর্তী সময়ে পরিশ্রমী বণিকদের দেশ হিসেবে গণ্য হতো। গড় আয়ে ভারত এবং পাকিস্তানকে তারা একটি পর্যায়ে অতিক্রমও করেছিল। যদিও ডলারের পিপিপি মাপে ভারত এগিয়ে। সাক্ষরতার হারে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে ভারতকে ধরে ফেলেছিল গত কয়েকবছর। আর্থিক বৃদ্ধির হারে পাকিস্তান ও চীনকে টপকে যায় বাংলাদেশ ২০২২-এ। কমেছিল শিশু মৃত্যুর হার। বেড়েছিল গড় আয়ু। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব সম্পদ সূচকে এই সময়ে ছাড়িয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তানকে।

কিন্তু কীভাবে? কৃষি, পরিষেবা ও উৎপাদন সব ক্ষেত্রেই কিছুটা অগ্রগতি করে বাংলাদেশ ছুঁয়েছিল বিশ্বের প্রায় সব বাজার। পঞ্চাশ বছরে তাদের দেশের আয় বেড়েছিল ২৭১ গুণ। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রা নীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শিক্ষার গুণগত মানের পরিচয়বাহী ছিল। শেখ হাসিনা সরকার প্রথম থেকেই বেসরকারি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে, রপ্তানি বাড়িয়ে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে জোর দিয়েছে, যে ব্যাপারে এখনো ছুঁতমার্গ কাটেনি কলকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের। বাংলাদেশের গড় আয় কিছুদিনের জন্য ছিল ভারতের থেকে বেশি। ১৯৭১-এ কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা থেকে ওই দেশের আয়ের পরিমাণ ছিল ৬০ শতাংশ, ১৩ শতাংশ এবং ৩৭ শতাংশ, যেখানে আজ ১৩.৩ শতাংশ, ৫১.৩ শতাংশ এবং ৩৭ শতাংশ। আরএমজি (রেডি-মেড গারমেন্টস্) অর্থাৎ বস্ত্রশিল্প ছিল তাদের মূল আয়ের উৎস, যেখানে ৪৫ লক্ষ মানুষ কাজ করত। এছাড়া ফার্মা, চর্ম, জাহাজ, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, কেমিক্যাল এবং সার সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এর কারণ হাসিনা জমানায় ব্যাপক আর্থিক সংস্কার যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি, শিল্প নীতি, রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রা নীতি। ১৯৭১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রপ্তানি বেড়েছিল ১০০ গুণ। সেচের উন্নতি কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছিল বহুগুণ, যা ১৯৭৭-এর পর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় একটুও এগোয়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কৃষি নীতি এনে আজ বিরোধিতার সম্মুখীন, আজ থেকে দুই দশক আগেই বাংলাদেশে তা কার্যকর হয়েছে এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি করে তারা তার ফলও পেয়েছে। বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা থেকে ওদের আয় ১৯৭০ সালের ৩৩৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালে ২১.৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেরও বহু মানুষ বিদেশে আছেন, কিন্তু তারা আর দেশে ফেরার কথা ভাবেন না এবং অধিকাংশই বাড়িতে টাকা পাঠান না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামাজিক শিক্ষা একটা বড়ো কাজ করেছে বাংলাদেশে। বামপন্থা জারিত বস্তুবাদ এই পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বন্ধনই ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি-ব্যবসারত বাংলাদেশি নাগরিকরা তাদের দেশে নিয়মিত টাকা পাঠান। এই পঞ্চাশ বছরে সেদেশে দারিদ্র্য ৮০ থেকে নেমে ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে কমে ১.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বন্দর, সড়ক, বিমানবন্দর, মেট্রো রেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এআইআইবি, জেআইসিএ বাংলাদেশে ভালো বিনিয়োগ করেছিল। অনেকের মতে বাংলাদেশ ২০৩০ সালে জাপান বা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছিল। এমন সময় তাঁদের উপর দৃষ্টি পড়লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ স্টেট খেলোয়াড়দের। ঢাকায় হলো জেহাদি অভ্যুত্থান। তারা নাকি আবার পেল 'স্বাধীনতা'। অত্যাচার শুরু হলো পুলিশ, ক্ষমতাসীন দলের কর্মী নেতা এবং সবচেয়ে বেশি করে হিন্দুদের উপর। হিন্দু সরকারি আধিকারিক এবং শিক্ষক অধ্যাপকদের জোর করে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া শুরু হলো। চলে লুট, ধর্ষণ, খুন ও বিভিন্ন অত্যাচার। বন্ধ হলো বিচার পাওয়ার সব রাস্তা।

তাদের দেশের কারেন্সি নোটে (মুদ্রায়) ছিল শেখ মুজিবুরের ছবি। সেই ছবিতে আপত্তি থাকার কারণে সেখানে ঘোষিত হয়েছে নোটবাতিল। অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য ইউনুস প্রশাসন জামাতিদের চীনে পাঠিয়েছিল বলেও মাঝে খবর পাওয়া যায়। মুজিবের ছবি সংবলিত গোছা গোছা নোট পোড়ানোর ছবি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে মাঝে দেখা যায় ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলন। এক মৌলভি তার স্ত্রীর কেনা সব ভারতীয় কাপড় প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলে। বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডারের এমন বেহাল দশা যে পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশি ব্যাংকগুলির তরফে ইস্যু করা এলসি (লেটার অফ ক্রেডিট) হয়ে পড়ছে অকেজো। বিদেশি মুদ্রা না থাকায় তারা নাকি মজুত সোনার বিনিময়ে নানা পণ্য আমদানির পরিকল্পনা করছে। দেউলিয়া হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে কয়েকটি দেশের সঙ্গে ডিফেন্স ডিল করবে বলে ঘোষণাও করেছে তারা। কিন্তু কীভাবে অর্থ জোগাড় হবে তা হয়তো তাদেরও অজানা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ বাংলাদেশের থেকে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর প্রাপ্য প্রায় আট হাজার কোটি টাকা। এমতাবস্থায় ভারত তাঁদের কাঁচামাল, কৃষি দ্রব্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পাঠানো বন্ধ করলে কি তারা আর এগোতে পারবে? যদি তাদের সামনে বন্ধ হয়ে যায় ভারতীয় বাজার? কাল যদি ভারত তাদের আকাশপথ বন্ধ করে দেয়? যদি ভারত সমুদ্রপথে বাধা সৃষ্টি করে? এরমধ্যে আরাকান সেনা ঢুকে পড়েছে তাঁদের দেশে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। কমছে বাংলাদেশের টাকার দাম। এই অবস্থায় তারা পারবে তাদের পরিকাঠামো উন্নয়ন চালু রাখতে? হিন্দুদের তো চাকরি থেকে সরালে। নিজেদের লোকজনকে মাইনে দেওয়ার টাকা থাকবে? ভারত যদি চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেয় উপরোক্ত স্বাস্থ্য সূচক ধরে রাখতে পারবে? দারিদ্র্য আবার ১৯৭১ ছোঁবে না তো? মানুষ ব্যাংকের ইএমআই দেওয়া বন্ধ করেছে মুদ্রাস্ফীতির জন্য। শিল্পে খরা আসায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও পারছে না ব্যাংকের লোন শোধ করতে। কাল ব্যাংক ডুবলে কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ? আইএমএফ তাঁদের ধার দেবে? আসবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ? ধার দেবে বিশ্বব্যাংক, এডিবি? কীভাবে শোধ করবে তাদের লোন? নাকি তাদের গুরু পাকিস্তানের মতো আবার লোন নেবে পুরোনো লোন শোধ করার জন্য?

বাংলাদেশ নাকি পৃথিবীর একমাত্র সভ্য মুসলমান দেশ যেখানে বিচারব্যবস্থায় সমস্যা আছে বলে বলা হচ্ছে। বাকি ইসলামি দেশে বিচার ব্যবস্থাই নেই। আসলে এরা সভ্য এখনও কিছু হিন্দু আছে বলে। আর হিন্দু আছে বলেই পৃথিবী এদের সিরিয়া, ইরান বা পাকিস্তানের মতো এখনও ছারপোকা ভাবে না। যেদিন জেহাদিরা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে ফেলবে, সেদিন তাদের উপর কোনো প্রতিবেশী দেশ— বাংলাদেশি জেহাদ প্রতিরোধে, নিজেদের সুরক্ষায় কিছু ঘটালে সবাই চোখ বুজে থাকবে। আর চোখ খুলে ঘুমোতে হবে বাংলাদেশি জেহাদিদের। যেমন আজ লেবানন, সিরিয়া বা ইয়েমেনবাসীকে করতে হয়।

□

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিপ্লব বিকাশ

১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সশস্ত্র সেনা ১৬ ডিসেম্বর ভারতের কাছে আত্মসর্পণ করে এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই বিজয়ের কাহিনি শুধুমাত্র রণক্ষেত্রের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনন্য অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণ এবং হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমে পুণ্যভূমি ভারতকে পরম বৈভবশালী করার সাধনায় শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। সঙ্ঘ ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে দেশের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা ও সেবাভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যখনই জাতি সংকটে পড়েছে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কেবলমাত্র সহযোগিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সমাজে নবজাগরণ ও প্রেরণার আলো জ্বালিয়েছে।

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে যখন আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা স্মরণ করি, তখন সেই মৌন তপস্বীদের যারা জাতীয় প্রয়োজনে নিজেদের সর্বস্ব সমর্পণ করে এক অনন্য দায়িত্ব পালন করে তাঁদের ত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সম্মান জানানো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধের সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেশের পূর্ব সীমান্তে শরণার্থীদের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিরাম সেবা এবং অটুট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল প্রেরণাদায়ী নন, বরং দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সাংস্কৃতিক মূলবোধের এক জীবন্ত উদাহরণ। শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান, সীমান্ত ক্ষেত্রের জনগণের মধ্যে সচেতনতার বার্তা, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং ভারতীয় সেনার পাশে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা— এগুলি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এক অসামান্য দায়িত্বশীলতার চিত্র তুলে ধরে। বিজয় দিবস আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও সমাজের প্রতিটি স্তরে সঙ্ঘের এই নিঃশব্দ কর্মযজ্ঞ, জাতির সেবা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

করোনা অতিমারীর মতো সংকট হোক বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্বয়ংসেবকরা সংগঠিত শক্তি ও সেবাকাজের মাধ্যমে প্রত্যেকবার সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের প্রায় এক বছর আগে, উত্তরবঙ্গে প্রবল

বৃষ্টির কারণে মহানন্দা নদী যখন ভয়ংকর রূপ নেয় এবং মালদা শহর ভয়াবহ বন্যার ঝুঁকির মুখে পড়েছিল, তখন সঙ্ঘের প্রায় ১৫০ জন স্বয়ংসেবক সারা রাত বাঁধ মেরামত করে শহরটিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। এর দুই বছর আগে জলপাইগুড়ি শহরে প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করে। তাঁরা জলপাইগুড়িতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ায় প্রথম দল ছিলেন। সঙ্ঘের এই দ্রুত পদক্ষেপ ও সমর্পণ কেবল ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করেছিল তা নয়, বরং সমাজের মনোবলও দৃঢ় রেখেছিল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বাইরে, যুদ্ধকালীন সময়েও স্বয়ংসেবকরা নিজের জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন পাঠানকোট রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ট্রাক থেকে নামানোর কাজে স্থানীয় কুলিদের ধর্মঘটের কারণে সমস্যা দেখা দেয়। এমন সংকজনক অবস্থায় সঙ্ঘের শতাধিক স্বয়ংসেবক শত্রুর গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যেই এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। স্বাধীনতার পরে কাশ্মীরে পাকিস্তানি আক্রমণের সময়ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শ্রীনগর বিমানবন্দর মেরামতের কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় বায়ুসেনা বিমানবন্দর ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যার ফলে পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়।

সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক দেশবাসী এবং স্বয়ংসেবকদের সবসময়ই প্রেরণা দিয়ে থাকেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় তদানীন্তন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সকল রাজনৈতিক মতবিরোধ ভুলে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি নাগরিক নিরাপত্তা, রক্তদান এবং আহত সৈন্যদের সেবা করার আহ্বান জানান স্বয়ংসেবকদের। এই আহ্বানের প্রভাব দেশজুড়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নাগরিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে উদ্ধার কাজ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সঙ্ঘ সত্যিই দ্বিতীয় ফ্রন্ট সামলানোর ভূমিকা পালন করেছিল। তদানীন্তন প্রান্ত সঙ্ঘচালক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে একটি পত্র পাঠিয়ে জানান যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। খানসেনার আক্রমণে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। এই অভূতপূর্ব সংকটের সময় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে শরণার্থীদের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে স্বয়ংসেবকরা। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, মনোবল বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছিল। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা একনাথ রানাডে এবং ভাউরাও দেওরস বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে সেবা কাজকে উৎসাহ এবং দিশা দান করেন। এই শিবিরগুলিতে শরণার্থীদের জন্য কেবল ভোজন ও বাসস্থানের সহায়তা সীমাবদ্ধ না থেকে, তাদের আত্মনির্ভরশীলতার দিকে উদ্যোগী করারও প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ এবং আক্রমণের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বালুরঘাটে পাকিস্তানি সেনার আক্রমণের সময় স্থানীয় নাগরিকরা সুরক্ষিত স্থানে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য হচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা শুধুমাত্র এলাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকে গিয়ে আহতদের সাহায্য করেছিলেন এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও মানসিক সাহসও জুগিয়েছিলেন। তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্ঘের কার্যকর্তারা সঙ্ঘের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের মনে সাহস জুগিয়ে এবং নিজের গ্রামকে রক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই প্রেরণায় নাগরিকরা ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজেদের গ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। সঙ্ঘের এই নিঃস্বার্থ সেবা সমাজের প্রতিটি স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক একতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিল।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সংকটের সময় শুধুমাত্র সেবাকাজে সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং জাতির স্বার্থে নিজেদের প্রাণের উৎসর্গে কখনো পিছপাও হন না। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে বালুরঘাটের কাছে চকরামপ্রসাদ গ্রামে শাখার মুখ্যশিক্ষক চুরকা মুর্মু তার আত্মবলিদানের মাধ্যমে এই আদর্শকে প্রতিস্থাপন করেন। গোলাবর্ষণের মধ্যে তিনি অদম্য সাহস দেখিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতির সংবাদ দেন এবং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করেন। এই চেষ্টায় তিনি নিজের প্রাণ বলিদান দেন। তার এই অতুলনীয় ত্যাগ গোটা অঞ্চলে প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে এবং একতা ও সেবার অনুভূতিকে দৃঢ় করে। মালদায় সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য গঠিত সৈনিক অভ্যর্থনা সমিতিতে সঙ্ঘের প্রচারক বংশীলাল সোনী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সমিতি রক্তদান শিবির আয়োজন করে আহত সেনাদের জীবন রক্ষা করতে সহায়তা করে এবং যুদ্ধ থেকে ফেরত আসা সেনাদের অভ্যর্থনার জন্য একটি স্বাগত কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কেন্দ্রে ৩৩ হাজার ৬৬৭ সেনা ও অধিকারীকে চা, চন্দনের ফোঁটা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। এই স্বাগত কেন্দ্র ২১ দিন ধরে চলেছিল এবং এর পুরো পরিচালনা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা করেছিলেন। এই সেবা কর্মকে সম্মান জানিয়ে তৎকালীন মালদা জেলা শাসক এসপি দে সঙ্ঘকে একটি সরকারি পত্র পাঠিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যুদ্ধশেষে পূর্বাঞ্চল সেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা সঙ্ঘের প্রচারক বংশীলাল সোনীকে তাঁদের সেবাকাজের জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘের সেবা ও দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা জাতি ও মানব সেবাকে তাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আজ যখন সেই বাংলাদেশকে মানবতা-বিরোধী চক্রান্তকারীদের দ্বারা অশান্ত করা হচ্ছে, তখন সড়ক থেকে সংসদ পর্যন্ত সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে মানবতার রক্ষা করতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছেন। □

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়

রাষ্ট্র নির্মাণের এক বিস্ময়কর কর্মশালা

সাধন কুমার পাল

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩— এই পাঁচ বছর স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসেবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলমেশা করে ভারতকে গভীরভাবে বুঝে ওঠা। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যখন রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ চরিতের উপাদান সংগ্রহ করছিলেন, তখন শান্তিনিকেতনে একদিন জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, আমি তাঁকে বলেছিলাম--- If you want to know India, study Vivekananda. In him there is nothing negative, everything positive.' অর্থাৎ ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে পড়তে হবে। আজকের দিনে কবিগুরু বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বুঝতে হবে। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতজুড়ে 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানে'র ভারতীয়দের এমন ব্যবহারিক সহাবস্থানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যে বাহ্যিক বিভেদের খোলসগুলো আপনা থেকেই খসে পড়ে হিন্দুত্বের ভাব রসে এমনভাবে জারিত হচ্ছে যে সবারই মনে হচ্ছে এই ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষেই এক অবিভক্ত সত্তা এবং ভারতীয়রা কার্যত একই ভারতমাতার সন্তান।

গত ১৮ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, নাগপুরের রেশিমবাগ স্মৃতি মন্দির পরিসরে অনুষ্ঠিত হলো সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ, দ্বিতীয় (বিশেষ)। সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে যে নতুন প্রশিক্ষণ ধারা শুরু হয়েছে সেই ধারার এটাই ছিল ৪০-৬৫ বয়স শ্রেণীর জন্য সর্বপ্রথম বিশেষ বর্গ। সন্দেহ নেই এই বর্গ একটি ঐতিহাসিক বর্গ। এই বর্গে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে ৮৬৫ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দশম শ্রেণী থেকে শুরু করে পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত। পেশাগত দিক থেকে অটোড্রাইভার, কৃষক থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, অধ্যাপক এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন।

বর্গের পরিবেশ দেখলে মনে হয় যে, সবাই যেন শিক্ষাগত যোগ্যতা, অবস্থান, জাতপাতের রচনা সবটাই যেন বাইরের পোশাকের মতো খুলে রেখে মানুষ হিসেবে একাকার হয়ে যাওয়ার এক বিস্ময়কর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। এই একাকার হয়ে যাওয়ার মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল কবির সেই শাশ্বত রচনা 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান; বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। বর্গ শুরু হওয়ার প্রথম দুদিন প্রদেশ অনুসারেই থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তার পরের ২০ দিন এই শিবিরের প্রত্যেকটি আবাস কক্ষ যেন একটি ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে। সেখানে ছিল নানা ভাষা, ভূষা, খাদ্যাভাসের লোক। চেহারাও ছিল কত ধরনের। মণিপুর, অসম থেকে শুরু করে সেই তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশের মতো আঠারোটি প্রদেশের মানুষ নিয়ে এক বিচিত্র কোলাজ ছিল এক-একটি বসতি কক্ষ। সবাই যে হিন্দিতে পাকাপোক্ত তা কিন্তু নয়। বিশেষ করে যারা দক্ষিণ ভারতের ছিলেন তাদের অনেকের ক্ষেত্রেরই হিন্দি বলা, লেখা ও পড়তে পারাটা বেশ সমস্যার। তবে ভাব ঠিক থাকলে ভাষা যে কোনো বিষয় নয় এটা প্রত্যক্ষভাবে বোঝার সুযোগ হয়েছে এই প্রশিক্ষণ বর্গে থেকে। ব্যক্তিত্বের বড়াই সরিয়ে রেখে ২০ দিন একসঙ্গে থাকা, স্নান, ঘুমানো, খাওয়া, হাসি মজার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, উপাসনা পদ্ধতি, পারিবারিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থার সিংহভাগই উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে। আমরা যে বিবিধতা দেখি আসলে সেটা বাইরের, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগতভাবে ভারতীয়রা সবাই যে অভিন্ন এটা এক বড়ো উপলব্ধি।

সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ ধারায় কিছু নতুনত্ব সংযোজিত হয়েছে। এখন প্রথমে তিন দিনের প্রারম্ভিক বর্গ, সাত দিনের প্রাথমিক শিক্ষা বর্গ, এরপর ১৫ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ। প্রথম পর্যায়ের তিনটি বর্গে যা শেখানো হয় তা সঙ্ঘের পদ্ধতি অনুসারে সংগঠন বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট।

এর পরের ধাপে থাকে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ প্রথম যা ক্ষেত্র অনুসারে (দুটো বা তিনটে প্রশাসনিক রাজ্য নিয়ে একটি ক্ষেত্র) এবং সর্বশেষ ধাপ সর্বভারতীয় কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়, যা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর তপোভূমি নাগপুরের রেশিমবাগের স্মৃতি মন্দির পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। আমার ধারণা এই প্রশিক্ষণ ধারায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পরম্পরায় মডেলটি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পরম্পরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল, সেগুলোতে মূলত ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই শেখানো হতো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে মূলত চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ, উচ্চ ভাবনার সঙ্গে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া, উন্নত বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর মতো ব্যবস্থা থাকত। এখানেও প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মতো কার্যকর্তা বিকাশের জন্য কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ প্রথম এবং কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্গে অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের অষ্টমবিন্দু অর্থাৎ 'সমাধি' বাদে সাতটি বিষয়ের অভ্যাস প্রত্যক্ষভাবে করার সুযোগ রয়েছে এই বর্গ দুটিতে। বর্গের প্রাত্যহিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে যম-এর পাঁচটি অংশ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ও অপরিগ্রহের (নিজের খরচে শিবিরে অংশগ্রহণ) অভ্যাস নিজের অজান্তেই হয়ে যায়। তেমনি নিয়মের পাঁচটি অংশ শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপ, ঈশ্বর প্রণিধানের (ভোরবেলা স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়) অভ্যাসও স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে যায়। বর্গে স্বাধ্যায়ের একটি পৃথক কালাংশ থাকে যেখানটায় নিজের পছন্দের পুস্তক পাঠ করে নোট তৈরি করে বুক রিভিউ করতে হয়। আসন, প্রাণায়ামের জন্য কালাংশ সঙ্ঘের প্রত্যেকটি বর্গেই থাকে। কিছু অভ্যাস থাকে মানুষ যার দাস হয়ে যায়। এই সমস্ত অভ্যাস প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবন উন্নতমাত্রা লাভ করতে পারে। নিজের প্রিয় পোশাক, বিছানা, ভোজন 'প্রত্যাহার' করে বর্গের উপযোগী অতি সাধারণ পোশাক, শয়ন ব্যবস্থা ও ভোজন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পূর্ণ সময় অতিবাহিত করতে হয়। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের মতো নিত্য সঙ্গীটিকে পূর্ণ সময়ের জন্য সরিয়ে রেখে মহর্ষি পতঞ্জলি কথিত প্রত্যাহারের বিশেষ অভ্যাস বাহ্যিকভাবে করতে হয়। বর্গে সাধারণ সূচনা থাকে খুব প্রয়োজন ছাড়া পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ না করা। অর্থাৎ নিজেকে সাংসারিক ভাবনা থেকে পূর্ণ মুক্ত করে তপস্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করা।

যারা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার একটি পূর্ণ অনুশীলন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধিক কার্যক্রম স্তোত্রপাঠ, সমবেত একক গীতের মাধ্যমে ও ধ্যানের অভ্যাস হয়েই যায়।

এই বিকাশ বর্গগুলোতে দোষমুক্ত শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার জন্য ব্যববাহিক প্রশিক্ষণকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয় যে সঙ্ঘের প্রাণ সঙ্ঘস্থানের জন্য বরাদ্দ কালাংশে কাটছাঁট করে সেই জায়গায় হাতে কলমে শেখানোর কর্মশালা রাখা হয়। শক্তিশালী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রক্রিয়া পুনঃস্থাপিত করার জন্য সঙ্ঘে ছ'টি গতিবিধি রাখা হয়েছে। সামাজিক সমরসতা, ধর্মজাগরণ, গো-সেবা, গ্রাম বিকাশ, কুটুম্ব প্রবোধন ও পরিবেশ রক্ষা। কার্যকর্তারা নিজের রুচি অনুসারে যে কোনো একটিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। তবে প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণেরই মূল বক্তব্য হলো এই পরিবর্তনগুলি নিজের থেকে এবং নিজের পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। যেমন সামাজিক সমরসতা বিষয়ে কাজ শুরু করতে হবে নিজের বাড়ি থেকে। শুরুতেই নিজের পাড়ার বা বাড়ির সাফাই কর্মীকে কোনো ভেদাভেদ না করে আত্মীয়জ্ঞানে দেখতে হবে। সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষটিকে নিজের পূজা ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। ঠিক একইভাবে সমাজের সর্বত্র এই সমরস ভাব প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করতে হবে।

রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষুদ্রতম একক হলো পরিবার। সেজন্য পরিবার প্রবোধন বিষয়ে কাজ করতে হলে সবার প্রথমে নিজের বাড়ির ছাদের তলায় দুই প্রজন্ম বা তিন প্রজন্ম একসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করছে কিনা, হিন্দু রীতিনীতি মানছে কিনা, সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। প্রত্যেক পরিবারে ভজন, ভোজন, ভাষা, ভূষা, ভবন ও ভ্রমণ— এই ছয়টি বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ থাকুক, এই প্রয়াস চালানো হয়। প্রত্যেকটি পরিবার ভক্তিময়, শক্তিময়, আনন্দময় হয়ে উঠুক এই উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে হলে সর্বপ্রথমে দেখতে হবে যে নিজের বাড়ি প্লাস্টিক মুক্ত কিনা, নিজের বাড়িতে জলের অপচয় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ হয়েছে কিনা, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে কিনা। গ্রাম বিকাশের ক্ষেত্রেও একই কথা, আমরা নিজেরা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সরিয়ে রেখে জৈব চাষ শুরু করেছি কিনা, আমার নিজের গ্রামের পরিবেশ নেশা মুক্ত কিনা, আমার গ্রাম স্বনির্ভর গ্রাম কিনা। আমার গ্রাম নিয়ে প্রত্যেকটি উত্তর ইতিবাচক হলে এরপর আশেপাশে গ্রাম নিয়ে ভাবতে হবে এটাই প্রশিক্ষণের মূল কথা।

বর্গে প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণের মূল কথাই হলো সমাজ পরিবর্তনের ধারা নিজেকে দিয়ে শুরু করে তা নিয়ে যেতে হবে সমাজের মধ্যে। সমাজ জাগরণের লক্ষ্যে সেবা, সম্পর্ক, প্রচার এই তিনটি কার্যবিভাগ নিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানেও কার্যকর্তাদের তাদের রুচি অনুসারে যে কোনো একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কীভাবে সেবার মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলা, আত্মসম্মান জাগিয়ে তোলা যেতে পারে সেই প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়। সঙ্ঘের সেবা বিভাগ থেকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিষয়টিকে সরকারি তন্ত্র থেকে বের করে এনে সমাজের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ে যাচ্ছে। দেশবিরোধী শক্তির ন্যারেটিভের জবাব কী করে দিতে হবে, দেশের গঠনমূলক বিষয়গুলোকে কীভাবে সমাজের সমানে তুলে ধরতে হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রচার বিভাগে দেওয়া হয়। সমাজের অপশক্তিগুলো যেন অনেকটাই সংগঠিত। সেজন্য সমাজে ওরা সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সমাজের সজ্জনশক্তি সংগঠিত নয়। এই সজ্জনশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করে তাদের সংগঠিত উপায়ে কীভাবে সমাজ জাগরণের কাজে লাগানোর যায় সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন থাকে সম্পর্ক বিভাগের কর্মসূচিতে।

কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ-দ্বিতীয়তে সর্বভারতীয় মঞ্চে ভারতের প্রত্যেকটি এলাকার আঞ্চলিক সংস্কৃতি তুলে ধরার বড়ো সুযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তারা সর্বভারতীয় মঞ্চে মালদহের গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করে সর্বভারতীয়স্তরে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। এই বর্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ছাড়াও এই অঞ্চলের উন্নয়নে যাদের অবদান রয়েছে সেই সম্পর্কে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। সর্বভারতীয় মঞ্চে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার অবদান নিয়ে বিশেষ আলোচনার সুযোগ উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তারা পেয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আসা সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থীদের কাছে 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে' এই গানের ভাব যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল নাগপুরের মাটিতে। তেমনি বৈভবময় ভারত নির্মাণই অন্তিম লক্ষ্য এটাই কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ-দ্বিতীয়র চূড়ান্ত বার্তা। □

কুয়েতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কুয়েতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অব মুবারক দ্য গ্রেট' প্রদান করা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। গত ২২ ডিসেম্বর কুয়েতের ধনাঢ্য শেখ মশাল অল-অহমদ অল-জাবের অল-সবাহ এই সম্মান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেন। এই সম্মান আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ দীর্ঘ ৪৩ বছর পর ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী কুয়েত সফরে যান এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রথমবার সফরেই সে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রাপ্তি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আব্দুল্লা অল বরুন এবং আব্দুল লতিফ অল নসেহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আব্দুল্লা অল বরুন আরবি ভাষায় অনুবাদ করা রামায়ণ ও মহাভারত মোদীজীর হাতে তুলে দেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়ার সামগ্রী অটোমোবাইল, ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল যন্ত্রাংশ কুয়েতে সুনাম অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্যান্য ব্যবসা ফার্মাস্যুটিকাল, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল, বস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি কুয়েতের বিকাশে সেদেশে কার্যরত ভারতীয়দের কাজের প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কুয়েত সফর এবং সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্তি দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে।

কানপুরে মুসলিম বহুল এলাকায় মন্দির উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কানপুরের মুসলিম বহুল বেকনগঞ্জ এলাকায় মুসলিম দখলমুক্ত হলো ৫টি মন্দির। কানপুরের মেয়র প্রমিলা পাণ্ডে প্রাচীন মন্দিরগুলিকে জবরদখল থেকে মুক্ত করান।

গত ২১ ডিসেম্বর ৭টি থানার পুলিশ ফোর্স নিয়ে মেয়র প্রমীলা পাণ্ডে বেকনগঞ্জে অভিযান করেন। প্রথমে রাধাকৃষ্ণ মন্দির যান, সম্পূর্ণ মন্দির সেসময় আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল। মন্দিরের পিছনেই বিরিয়ানির দোকান খোলা হয়েছিল। মেয়রের নির্দেশে অল্প সময়ের মধ্যেই তা খালি করে মন্দিরকে আগের অবস্থায় ফেরানো হয়।

এরপর রামজানকী মন্দির, শিবমন্দির-সহ মোট ৫টি মন্দিরের তালা খোলা হয়। মেয়র সংবাদমাধ্যমে জানান, বেকনগঞ্জ একসময় সোনার জন্য বিখ্যাত ছিল, প্রতি ১০টি বাড়ি অন্তর ১টি করে মন্দির ছিল। ১২০টিরও বেশি মন্দির জবরদখল হয়ে আছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মন্দির উদ্ধার হলেও মন্দিরগুলি থেকে কোনো মূর্তি পাওয়া যায়নি।

শোক সংবাদ

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জগদীশ চন্দ্র ঘোষ গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী,২ পুত্র,১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। মাথাভাঙ্গায় সঙ্ঘকাজের সূত্রপাত তাঁর হাত ধরেই হয়েছিল। মাথাভাঙ্গা মহকুমার সঙ্ঘচালক রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাথাভাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মিলন মন্দিরের প্রধান উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে আস্তানা গেড়েছে চীন ও পাকিস্তানের নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪,৩৭৬টি জায়গার মালিকানা রয়েছে শত্রুদেশের নাগরিকের কাছে। তার মধ্যে ৫৬টি চীনা নাগরিকের এবং ৪,৩২০টি পাকিস্তানি নাগরিকের। শুধুমাত্র কলকাতাতেই ৯০টি জায়গা রয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি চীনা এবং ৭১টি পাকিস্তানি নাগরিকের। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্থান রয়েছে মুর্শিদাবাদে, ১৭২৮টি জায়গায় পাকিস্তানি নাগরিকের।

গত ১৮ ডিসেম্বর সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান, পশ্চিমবঙ্গে শত্রুদেশের নাগরিকের মালিকানাধীন কত সম্পত্তি রয়েছে? এবিষয়ে তিনি জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানও চান। এই সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সেই সম্পত্তি নিলামের কথা ভাবা হচ্ছে কিনা তাও জানতে চান। তার উত্তরে এই তথ্য দেওয়া হয়। এইসব জায়গার কোনোটিই গত তিন বছরের মধ্যে বিক্রি হয়নি। বরং ওই বহিরাগত নাগরিকরা জায়গাগুলি ভাড়া দিয়ে তিন বছরে ৬৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা আয় করেছে। এই জায়গাগুলির মধ্যে ৫৩৬টি পুনর্দখল হয়েছে এবং ৪৯টি উদ্ধারের কাজ চলছে।

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার ১৮ নভেম্বরের সংখ্যায় ২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সাল দু'টি যথাক্রমে ১৬৬৫ ও ১৬৭০ হবে। গত ২ ডিসেম্বরের সংখ্যায় ১৯ পৃষ্ঠায় শ্যামপুকুর লেনে শ্রীঅরবিন্দের একটি বাসভবনের বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে। ওই বাড়িটি ছিল শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত 'ধর্ম্ম' ও 'কর্মযোগিন' পত্রিকার কার্যালয়, তাঁর বাসভবন নয়। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—স্ব: স

ভারতে সন্ত্রাস সৃষ্টির টার্গেট : ধৃত ৮ বাংলাদেশি জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দুসমাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তারা ছিল টার্গেট। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকা জঙ্গি মডিউলকে ধরার পর বড়ো তথ্য পেলেন তদন্তকারীরা। এদের মধ্যে দু'জন ঘাঁটি গেড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। অসম থেকে পাঁচ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই এবং কেরালা থেকে এক— সব মিলিয়ে মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে অসম পুলিশ। এরা প্রত্যেকেই আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি-র) সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে স্লিপার সেল তৈরি করছিল তারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে এসে মুসলমান যুবকদের ব্রেনওয়াশ করে জঙ্গি কার্যকলাপে নিযুক্ত করা। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেরালা থেকে এই জঙ্গি সংগঠনের এজেন্টদের ধরা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে এদের থেকে বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, জেহাদি কার্যকলাপের প্রচারই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। এর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। সেই লক্ষ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের কাজও চলছিল। দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে হামলার পরিকল্পনা ছিল তাদের, কিন্তু অসম পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, সরাসরি বাংলাদেশ থেকেই এদেশে তাদের পাঠানো হয়েছিল। তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন যে ধৃত শাদ রাদি বাংলাদেশের বাসিন্দা। গত নভেম্বরে তাকে পাঠানো হয় ভারতে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত দু'জনের নাম— মিনারুল শেখ ও আব্বাস শেখ। ৪৮ বছরের মিনারুল পাম্প মেকানিক ছিল। গত ১৯ ডিসেম্বর অসম ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গুয়াহাটির উলুবাড়িতে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অসম পুলিশের স্পেশাল ডিজিপি হরমীত সিংহ। তিনি বলেন, 'প্রাপ্ত নথি অনুযায়ী এই জেহাদি স্লিপার সেলগুলি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তাদের মাথাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলত। গোপন ও সন্দেহজনক অ্যাপ ব্যবহার করে আলাপ-আলোচনা চলত। বিকৃত বা পরিবর্তিত লেখা-সহ জেহাদি বইপত্রও পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশি পাসপোর্ট, শংসাপত্র ইত্যাদিও উদ্ধার হয়েছে'। তিনি আরও জানান, 'ফারাহ ইশাক বাংলাদেশ থেকেই অপারেট করছিল। জঙ্গি সংগঠন এবিটি-র প্রধানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা এবং হিন্দুরা তাদের টার্গেট ছিল। এর পাশাপাশি দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর পরিকল্পনা ছিল'।

ইউনুস প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো করার দিবাস্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। সেই উদ্দেশ্যে ফেসবুক পোস্ট পর্যন্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু চাপে পড়ে সেটি আবার পরে সরিয়েও দেন। এনিয়ে এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া দিল ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, 'এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বাংলাদেশের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ওই বিতর্কিত পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে। তবে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিজেদের জনসাধারণের মন্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বলতে চাই। ভারত বারবার বাংলাদেশের জনতার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিতে আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বজ্ঞান থাকা দরকার।'

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৭৫৭ সালের আগের 'সুবে বাঙ্গলা' পাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছেন এই মাহফুজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে চরম ভারত বিরোধিতাও। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়েছে, বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন। হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভু কারাবন্দি হয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ৪৭টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে যথাক্রমে ৩০২ এবং ২,২০০টি সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলির তথ্য উদ্ধৃত করে রাজ্যসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ। তিনি জানান, 'ভারত সরকার এই ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে। গত ৯ ডিসেম্বর ভারতের বিদেশ সচিবের বাংলাদেশ সফরের সময়ও তা জানানো হয়েছে ঢাকাকে।'